This Book Download From

www.shopnil.com

এক সময় ছোট ছোট অনেক উপন্যাস লিখেছি। আলাদা আলাদা বই হয়ে বাজারেও ছিল সেব লেখা। ইদানিং ওইসব লেখার দুটো তিনটে করে এক মলাটের ভেতর নিয়ে আসছি। তেমন একটি বই 'নাম রেখেছি ভালবাসা'। এই বইতে আছে

বলো তারে
ছেলেমানুষি
পিঞ্জর

এই লেখাগুলো আলাদা আলাদা বই হয়ে আর কখনও বেরুবে না। 'নাম রেখেছি ভালবাসা' পাঠকের ভাল লাগলে আনন্দিত হবো।

ইমদাদুল হক মিলন

বলো তারে

গভীর রাতে টেলিফোন এলে জাকি খুবই বিরক্ত হয়। ঘুম ভেঙ্গে টেলিফোন ধরতে হলে পরিচিত মানুষকেও অপরিচিত মনে হয় তার। গলার স্বর এমন রুক্ষ হয়ে যায়, প্রিয় মানুষের সঙ্গেও জাকি কথা বলে বেশ রূঢ় ভাষায়। কখন কখন অত্যন্ত প্রিয় কাউকে কাউকেও চিনতে পারে না।

জাকির ছোট ভাই খোকন থাকে নিউইয়র্কে। প্রায়ই জাকিকে টেলিফোন করে সে। তবে টেলিফোনটা করে সাধারণত দুপুর তিনটার দিকে। কী কারণে একদিন রাত দেড়টার দিকে করেছে। সেই টেলিফোন ধরে এত বিরক্ত হল জাকি, প্রথমে খোকনকে সে চিনতেই পারল না। চার পাঁচবার জিজ্ঞেস করল, কোন খোকন। তারপর যখন কনফার্ম হল খোকন তার ছোট ভাই, নিউইয়র্ক থেকে ফোন করেছে এবং নিউইয়র্ক আমেরিকায়, অপ্রয়োজনে অতদূর থেকে কেউ কাউকে টেলিফোন করে না, এসব কিছুই মনে রইল না জাকির, হাতের কাছে দুষ্টুমি করা ছোট ভাইকে যেমন করে ধমকে ওঠে মানুষ ঠিক তেমন করে একটা ধমক দিল খোকনকে। এত রাতে টেলিফোন করেছিস কেন? কী দরকার! ফোনটা দিনে করলে হত না।

খোকন প্রচন্ড থতমত খেল। তারপর এত মন খারাপ করল, কথা না বলে টেলিফোন নামিয়ে রেখেছিল। ততক্ষণে ঘুমভাব কেটে গেছে জাকির। খোকনের সঙ্গে কথা বলার জন্যে প্রস্তুতও হচ্ছে, কিন্তু খোকন তো ফোন নামিয়ে রেখেছে। জাকি আরও বিরক্ত হল। রাতে ঘুম ভাঙার পর সিগ্রেট সাধারণত খায় না জাকি। সে রাতে সিগ্রেট ধরিয়েছিল। পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে শাহিন। শাহিন আবার সিগ্রেটের গন্ধ সইতে পারে না। বেডরুম থেকে বেরিয়ে বারান্দায় চলে গিয়েছিল জাকি। খানিক পর জাকিকে বিছানায় না পেয়ে ধরফর করে উঠেছে শাহিন। বারান্দায় এসে জাকির পাশে দাঁড়িয়েছে। কি হল, রাত জেগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগ্রেট খাচ্ছ যে। ঘুম আসছে না?

জাকি কথা বলেনি।

শাহিন বলেছিল, ঘুম আসছে না তো আমাকে ডাকতে। দুজনে গল্প করতাম।

জাকি গম্ভীর গলায় বলেছিল, ঘুম ঠিকই এসেছিল।

তাহলে?

টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙেছে।

জাকির স্বভাব হচ্ছে খুব ছোট কোন কথাও, যা একটি বা দুটো বাক্যে খুবই কম সময়ে বলে ফেলা যায় তেমন কথা সে বলে ভেঙে ভেঙে এবং বেশ অনেকক্ষণ ধরে। তাও কথার পিঠে প্রশ্ন না করলে বলে না। তার এই স্বভাবের কথা জানে শাহিন। এজন্যে অবিরাম প্রশ্ন করে। সেরাতে শাহিন তারপর বলেছিল, কার ফোন?

আমারই।

www.shopnil.com

কে করেছিল?
খোকন?
কোন খোকন?
আমাদের খোকন?
নিউইয়র্ক থেকে?
হ্যাঁ।
কি বলল?
কিছুই বলেনি।
মানে?
আমি খোকনকে সহজে চিনতে পারিনি।
তারপর?
যখন চিনতে পেরেছি, ধমক দিয়েছি।
ঠিক করনি।
হ্যাঁ ঠিক করিনি।
তোমার স্বভাব তো এমনই, ঘুম ভেঙে টেলিফোন ধরতে হলে রেগে যাও।
খোকন খুব মন খারাপ করেছে।
স্বাভাবিক। অতদূর থেকে ফোন করল।
এখন আমারও খুব মন খারাপ লাগছে। হয়ত কোন দরকারে ফোন করেছিলো। হয়ত মাকে কোন ম্যাসেজ
আমার মনে হয় না। তাহলে তো ওবাসায়ই ফোন করত।
হয়ত ওবাসার ফোন খারাপ।
হতে পারে।
তারপর চুপ করে গেছে জাকি।
শাহিন বলেছিল, কাজটা খারাপ হয়ে গেল। ঠিক আছে এরপর রাতে টেলিফোন এলে তুমি আর ধরবে না। আমি ধরব।
কিন্তু আজ কদিন হল শাহিন বাসায় নেই। তার মায়ের বাড়িতে আছে। সে প্রথম বারের মত মা হতে যাচ্ছে। কদিন ধরে খুব বমি করছিলো। জাকি ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে, শুনল এই খবর। বিয়ের চার বছর পর প্রথম বাচ্চা আসছে সংসারে।
কিন্তু শাহিনের বমিটা খুবই বাড়াবাড়ি রকমের। মুহূর্তে মুহূর্তে বমি করছে। বাথরুমে গিয়ে বসেই থাকে। ওয়াক ওয়াক শব্দে মেজাজ মাঝে মধ্যে খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল জাকির। তাছাড়া কিছুই খেতে পারছে না মেয়েটি, মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে। শরীর অত্যন্ত দুর্বল। বাসায় একটি কাজের বুয়া আছে। মধ্য বয়সী মহিলা কিন্তু একেবারেই গবেট প্রকৃতির। তার কাছে শাহিনকে রেখে কাজে বেরুতে পারছিল না জাকি। সব শুনে শাহিনের মা এসে শাহিনকে নিয়ে গেলেন। কিছুদিন ওদের বাড়িতে থাকবে শাহিন। তিন মাসের দিকে বমি কমবে তখন ফিরে আসবে।
এদিকে জাকির আছে এক ছেলেমানুষি সমস্যা। সে একা ঘরে থাকতে পারে না। ভয় পায়। রাতে ঘুম হয় না। মুহূর্তে মুহূর্তে ঘুম ভেঙে যায়। আর মনে হয় অন্ধকার ফুরে কেউ এসে তার গলা টিপে ধরবে। জানালার পর্দা নড়ে উঠলে মনে হয় কে যেন হেঁটে গেল। কখন কখন মনে হয় কে যেন, কোন অশরীরী জিনিশ এমন করে চেপে ধরেছে শরীর, নড়তে চড়তে পারে না জাকি,

চিৎকার করতে গিয়ে দেখেছে গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় না। দশ বিশ সেকেন্ড থাকে এই অবস্থা, তারপর কেটে যায়। তখন ভয়ে কাঁটা দিয়ে থাকে গা। আর ঘুম আসে না। জাকির এই স্বভাবের কথাও জানে শাহিন। মায়ের বাড়ি যাওয়ার সময় জাকিকে সে বলেছিল, তুমিও চল। আমাদের ওখানে থাকবে।
জাকি রাজি হয়নি। শ্বশুর বাড়ি গিয়ে দিনের পর দিন থাকতে কি রকম পৌরুষে লাগে।
তবে জাকির ফ্ল্যাটটি এমন এক জায়গায় যেখান থেকে পাঁ মিনিটের দুরুত্ব তার শ্বশুর বাড়ি এবং নিজেদের বাড়ি। পূবদিকে নিজেদের পশ্চিমে শাহিনদের। ইচ্ছে করলে যখন তখন যে কোন একটায় গিয়ে উঠলেই হয়।
নিজেদের বাড়িতে জাকি খুব একটা যায় না। শাহিন চলে যাওয়ার পর প্রতিদিন সকাল বেলা কাজে বেরুবার সময় শাহিনদের বাড়িতে যায় সে। শাহিনকে দেখে যায়। কখন কখন নাশতাও করে শাহিনের সঙ্গে। দুপুর এবং রাতের খাওয়া বাইরে।
তবে রাতে নিজের ফ্ল্যাটে একা থাকার অভ্যেসটা হচ্ছে জাকির। যদিও ভয়টা কাটেনি এবং সারারাত ডাইনিং স্পেসে লাইট জ্বালিয়ে রাখে। মুহূর্তে মুহূর্তে ঘুম ভেঙে যায়। নিশ্চিন্ত ঘুম যেটুকু হয় সে হয় আজানের পর। ছেলেবেলায় নানির কাছে শুনেছিল রাতের বেলা ভূত প্রেত কিংবা জ্বীন পরী যারা চত্বরে বেড়োয় ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে লোকালয় থেকে পালিয়ে যায় তারা। বদআত্মা তো, আজানের শব্দে ফোসকা পড়ে যায় গায়ে।
এখন সেই বিশ্বাস আছে জাকির। সুতরাং নিশ্চিন্ত ঘুম হয় তার ফজরের আজানের পর। ঘন্টা তিনেক একটানা ঘুমোয় তখন।
এই ফাঁকে অবশ্য আর একটা কাজও হয়েছে জাকির, রাতেরবেলা যেহেতু জেগেই থাকে টেলিফোন এলে বিরক্ত হয় না সে। বরং খুশি হয়। টেলিফোনে কথা বলার সময় মনে হয় ফ্ল্যাটে সে আর একা নয়, কথা বলার মত মানুষ একজন আছে।
তবে টেলিফোন রাতেরবেলা আসেই না বলতে গেলে। আজ হঠাৎ করেই এল। পৌনে বারটার দিকে। আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে ছিল জাকি। দুবার রিঙ হতেই টেলিফোন ধরলো।
হ্যালো।
প্রথমেই কেউ কথা বলল না। টেলিফোনে কি রকম ঘ্যাসঘ্যাসে একটা শব্দ হল।
জাকির আবার বলল, হ্যালো।
ওপাশের মানুষটি এবার কথা বলল, হ্যালো।
তার কথার বলার শব্দে বোঝা গেল, ঢাকা নয়, ঢাকার বাইরে বহুদূর কোথাও থেকে ফোন করেছে কেউ।
কিন্তু কে? লোকটি কে?
জাকি বলল, কাকে চান?
লোকটি একটি নাম্বার বলল। এটা কি এত নাম্বার?
হ্যাঁ।
জাকির হাসান সাহেব আছেন?
বলছি।
অনেক চেষ্টার পর আপনাকে পেলাম। তিনদিন ধরে চেষ্টা করছি।
এখান থেকে ঢাকায় টেলিফোন পাওয়া খুব মুশকিল।
জাকি বলল, কিন্তু কে বলছেন আপনি।
আপনি আমাকে চিনবেন না।

এত রাতে কি দরকারে তাহলে
ইয়ে রেনুর খুব অসুখ
কথাটা বুঝতে পারল না জাকি। বলল, কার অসুখ?
রেনুর। খুব অসুখ।
কোন রেনুর?
সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে গেল।
জাকি দুবার হ্যালো হ্যালো করল তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখল। ব্যাপারটার মাথা মুন্ডু কিছুই মাথায় ঢুকল না তার। কে ফোন করেছিল। কোন রেণুর খুব অসুখ। রেণু নামের কাউকে তো জাকি চেনেই না।
জাকি তারপর যেখানে যত আত্মীয় স্বজন আছে তাদের কথা ভাবতে লাগল। কিন্তু রেণু নামের কোন মানুষের কথা তার মনে পড়ল না। ওই নামে জাকির পরিচিত কেউ নেই।
তাহলে কে ফোন করল।
জাকির নাম এবং নাম্বার তো ঠিকই বলল।
তাহলে?
জাকি মনে মনে অপেক্ষা করতে লাগল আবার বুঝি রিঙ হবে। আবার বুঝি সেই কণ্ঠ কথা বলবে।
কিন্তু না। অনেকক্ষণ কেটে গেল আর টেলিফোন এল না।
উঠে বাথরুমে গেল জাকি। বাথরুম থেকে ফিরে ফ্রিজ খুলল। বোতল থেকে ঢক ঢক করে পানি খেল। তীব্র শীতল পানি। শীতকাল নেই, গরমকাল নেই তীব্র শীতল পানি খাওয়া অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে জাকির। এবং রাতে যতোবার বাথরুমে যাবে ততবারই ফেরার সময় ফ্রিজ খুলে বোতল থেকে ঢক ঢক করে পানি খাবে।
কিন্তু বিছানায় শুয়ে আর ঘুম এল না জাকির। কেবল ওই টেলিফোনের কথা মনে হতে লাগল। কে টেলিফোন করল। কোন রেণুর খুব অসুখ। রেণু নামের কাউকে কি কখন চিনত জাকি।
না। জাকির কিছুতেই কোন রেণুর কথা মনে পড়ল না। রেণু নামেও পরিচিত কেউ নেই তার।
তাহলে ওই টেলিফোন।
নাম এবং নাম্বার সবই তো ঠিকঠাকই বলল ভদ্রলোক। তারপর রেণুর অসুখের খবর দিল। তার মানে রেণু নামের কারু অসুখের খবর জাকিকে দেয়ার জন্যেই ফোনটা করেছে কেউ। আগেও নাকি দুচারবার চেষ্টা করেছে। আজ হঠাৎ এত রাতে পেয়ে গেছে জাকিকে। জাকিকেই যে খবরটা দিতে চায় কেউ, এটা সত্যি।
কিন্তু জাকির নাম্বার তারা পেল কোথায়।
এসব ভেবে জাকি কি রকম একটু দিশেহারা হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগল কিন্তু ঘুম এল না তার।
কে ফোন করল।
কোন রেণুর খুব অসুখ।
রেণুর অসুখের খবর জাকিকে জানাতে চাওয়ার দরকার কি। কোথায় কোন রেণু অসুখে কষ্ট পাচ্ছে তাতে জাকির কি। জাকি তো কোন রেণুকে চেনেই না।
ঠিক ঘুম নয়, ভোররাতের দিকে একটু তন্দ্রা মত এল জাকির।

শাহিন বলল, তোমার কি হয়েছে?
জাকি চোখ তুলে শাহিনের মুখের দিকে তাকাল। মৃদু হাসল। কিছু না।
নিশ্চয় কিছু হয়েছে। আমি তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারি।
আমার মুখে কি হয়েছে?
তুমি রাতেরবেলা ঘুমোও নি।
রাতেরবেলা ভাল ঘুম তো অনেকদিন ধরেই হয় না আমার। তুমি জান একা ফ্ল্যাটে
তুমি যে কদিন আগে আমাকে বললে এখন একা থাকার অভ্যেস হয়ে গেছে তোমার। এখন আর ভয় পাও না।
তা বলেছি।
তাহলে কালরাতে ঘুমোওনি কেন তুমি।
জাকি আবার হাসল। কথা বলল না।
শাহিন এবার জাকির একটা হাত ধরল। বলো না।
কি বলব?
ঘুমোওনি কেন?
ঘুমিয়েছি।
তাহলে তোমার চেহারা অমন দেখাচ্ছে কেন?
সেভ করিনি বলে।
সেভ করনি কেন?
এমনি।
না নিশ্চয় তোমার কিছু হয়েছে। কথা বলতে বলতে তুমি কেমন আনমনা হয়ে যাচ্ছ।
চোখ তুলে অনেকক্ষণ শাহিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জাকি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।
শাহিন বেশ রোগা হয়ে গেছে। চোখ মুখ বসে গেছে। ঠোঁট শুকনো এবং কি রকম ফাটা ফাটা। মুখ দেখে শাহিনের জন্যে এত মায়া হল জাকির।
জাকি বলল, বমি কমেনি তোমার?
শাহিন ম্লান হাসল। না। তিনমাস হলে আস্তে ধীরে কমে যাবে।
আজও বমি করেছো?
তিনবার করেছি।
নাস্তা খাওনি?
খেয়েছিলাম। তারপরই বমি।
ও।
তারপর একটু থেমে জাকি বলল, তোমার জন্যে আমার খুব মায়া লাগছে।
আমারও তো তোমার জন্যে মায়া লাগছে।
আমার জন্যে কেন?
তুমি একা একা বাসায় থাকছ। রাতেরবেলা ঘুমোতে পারছ না। কোথায় কি খাচ্ছ নাকি না খেয়েই থাকছ।

www.shopnil.com

পাগল। এ জন্যে মায়া লাগবার কিছু নেই। আমি এখন বেশ একা থাকতে পারি। আর খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক মতই করছি। ওসব নিয়ে তোমার মন খরাপ করবার কিছু নেই।
আমাকে নিয়েও তোমার তাহলে মন খারাপ করবার কিছু নেই।
কেন? এই যে তুমি কিছু খেতে পারছ না, অবিরাম বমি করছ।
এমনতো সব মেয়েরই হয়।
সবার এমন হয় না।
কারু কারু বমি একটু বেশি হয়। ঠিক হয়ে যাবে।
তারপর একটু থেমে শাহিন বলল, তোমাকে নাস্তা দিতে বলি।
না।
কেন?
নাস্তা খেয়েছি।
কোথায়?
কোথায় আবার। বাসায়।
কি খেলে?
পাওরুটি আর কলা।
জেলি বাটার ওসব লাগাও নি?
না।
শুধু পাওরুটি আর কলা?
হ্যাঁ। জেলি বাটার লাগানো খুব ঝামেলার কাজ।
কোন ঝামেলা নয়। টোস্টারে রুটি সেকে ফ্রিজ থেকে বাটার আর জেলি বের করে নিলেই হতো।
তাত হতই।
করনি কেন?
অন্য কাজ ছিল যে।
কি কাজ?
ফ্রিজে পানি ছিল না।
সব বোতল খালি হয়ে গেছে?
হ্যাঁ।
কলসিতে পানি আছে তো?
হ্যাঁ তা আছে।
ওখান থেকে খেতে?
পানি না ফুটিয়ে খেতে পারি না আমি।
তাহলে পানি পেলে কোথায়?
নিজে পানি ফুটিয়ে সেই পানি ঠান্ডা করে সবগুলো বোতল ভর্তি করেছি। করে ফ্রিজে রেখেছি।
আগের একটা বোতলে সামান্য পানি ছিল তাই খেয়েছি।
শাহিন মিষ্টি করে হাসল। বাব্বা ভীষণ কাজের লোক হয়ে গেছো তুমি।
জাকিও হাসল। কথা বলল না।
শাহিন বলল, কফি খাও নি?
না।
কেন?

www.shopnil.com

কফি শেষ হয়ে গেছে। মনেই ছিল না। আজ একটা কিনে নেব।
এখন কফি দিতে বলব?
বল।
শাহিন কিচেনের দিকে চলে গেল।

জাকি ব্ল্যাক কফি খায়। দুধ চিনি ছাড়া। এবং পর পর দু কাপ। ব্যাপারটা শাহিন জানে। জানে বলেই তেমন ব্যবস্থা করছে। এক কাপ কফি রেখেছে জাকির সামনে আর কফি পটে আরেক কাপ রেখে পটটাও রেখেছে জাকির সামনে।
কফিতে প্রথম চুমুক দিয়েই জাকি বলল, কাল রাতে অদ্ভুত একটা টেলিফোন এসছিল।
শাহিন অবাক হল। অদ্ভুত টেলিফোন মানে?
হ্যাঁ।
কে করেছিল?
এক ভদ্রলোক।
কি বলল?
বলল রেণুর খুব অসুখ।
শাহিনের ভুরু কুঁচকে গেল। কোন রেণু?
জাকি কফিতে চুমুক দিল। হাসল। কথা বলল না।
শাহিন আবার বলল, কোন রেণুর খুব অসুখ?
জাকি বলল, কি জানি।
মানে?
মানে রেণু নামের কাউকে তো আমি চিনিই না।
তাহলে?
জাকি কথা বলল না।
শাহিন বলল, তাহলে রেণুর অসুখের খবর জানিয়ে তোমাকে টেলিফোন করল কেন?
জানি না।
অদ্ভুত ব্যাপার তো।
শাহিন একটু চিন্তিত হল।
জাকি ততক্ষণে পট থেকে দ্বিতীয় কাপ কফি ঢেলে নিয়েছে। কফিতে চুমুক দিতে যাবে, শাহিন বলল, ভদ্রলোক তোমার পরিচিত?
জাকি চোখ তুলে শাহিনের মুখের দিকে তাকাল। কোন ভদ্রলোক?
যে তোমাকে ফোন করেছিল।
আরে না।
তাহলে?
তাহলে কি?
তোমার ফোন নাম্বার পেল কোথায়?
কি জানি।
নাম্বার ঠিক বলেছিল?

হ্যাঁ। তখন পৌনে বারটা বাজে। দুবার রিঙ হল। ফোন তুলতেই ভদ্রলোক আমার নম্বারটা বলল। তারপর বলল আমাকে বেশ কদিন ধরে চেষ্টা করছে কিন্তু পাচ্ছিল না। শব্দে বোঝা গেল বহুদূরের টেলিফোন। ঢাকা থেকে নয়। ঢাকার বাইরের কোন মফস্বল কিংবা উপজেলা হবে। রেণুর অসুখের খবরটা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে গেল। আমি তারপর সারারাত অপেক্ষা করেছি ফোনটা আর আসেনি। আশ্চর্য ব্যাপার তো।

হ্যাঁ। আমার পুরো নাম বলল। জাকির হাসান। টেলিফোন নাম্বার বলল। কিন্তু রেণু কে। রেণু নামের কাউকে তো আমি চিনি না।

জাকির কথা শুনতে শুনতে শাহিনও বেশ চিন্তিত হয়ে গেছে।

এক সময় শাহিন ঠাট্টা করে বলল, তোমার কোন পুরনো প্রেমিকা টেমিকা হবে।

জাকি সামান্য চমকাল, এ্যাঁ।

হ্যাঁ। তোমার তো ম্যালা প্রেমিকা ছিল। তাদের মধ্যে রেণুও ছিল। তুমি হয়ত দুচারদিন প্রেম করেছ, অনেকদিন আগের কথা তাই রেণু নামটি এখন আর তোমার মনে নেই।

হতে পারে।

এ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল জাকি। তুমি যেভাবে বললে আমিও সেভাবেই জবাব দিলাম।

এবার শাহিনও হাসল। ঠিক তখুনি জাকি দেখতে পেল শাহিনের নাকফুলটি কি রকম কালচে হয়ে গেছে। নাকফুলে শাহিনকে খুব মানায় বলে নাকফুল কখন খোলে না শাহিন। পরে থাকে। অবশ্য জাকির কারণেই কাজটা সে করে। বিয়ের পর পর জাকি বলেছিল, শাহিন তুমি সব সময় নাকফুল পরে থাকবে। কখন খুলবে না। নাকফুলে তোমাকে খুব মানায়।

জাকির কথা রেখেছে শাহিন।

কিন্তু শাহিনের নাকফুল কালচে হয়ে গেছে জাকি তা এতদিন খেয়াল করেনি কেন?

ভেতরে ভেতরে জাকি কি রকম একটু অপরাধী হয়ে গেল।

বায়তুল মোকাররমের দোতলায় বেশ বড়সড় একটা সোনার মার্কেট আছে। সেখান থেকে চারশ পঞ্চাশ টাকায় একটি নাকফুল কিনল জাকি। মাঝারি ধরনের মুক্ত বসানো। দেখতে বেশ সুন্দর। জিনিশটি কেনার পর মন ভাল হয়ে গেল জাকির। নাকফুল দেখে শাহিন খুব খুশি হবে। নিজেদের ব্যবহারের যে কোন নতুন জিনিশ পেলে মেয়েরা খুব খুশি হয়।

জাকি তারপর সিগ্রেট টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। ঠিক সিঁড়ির মুখে বেলালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বেলাল বেশ মোটাসোটা হয়েছে। ফর্সা হয়েছে। গা থেকে ভুর ভুর করে পারফিউমের গন্ধ আসছিল তার। জাকি অবাক হয়ে বেলালের মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, তুই নাকি?

বেলাল হাসল। প্রশ্নটা তো আমিই আগে করতে চেয়েছিলাম। তুই নাকি?

কেন আমার তো তেমন কোনো চেঞ্জ হয়নি। আমাকে তো না চিনতে পারার কথা নয়। কোন কারণও নেই।

আমাকে না চিনতে পারার কোন কারণ আছে?

আছে?

www.shopnil.com

কি?

তুই বেশ মোটা হয়েছিস।

আর?

বেশ ফর্সা হয়েছিস।

আর?

ইয়ার্কি মারিস না।

তারপর একটু থেমে, সিগ্রেটে টান দিয়ে জাকি বলল, তোর সঙ্গে তো পাঁচ ছ বছর পর দেখা হল, না?

হ্যাঁ এরকমই হবে।

এতদিনে তোর অবনতি কি হয়েছে আমি জানি না। উন্নতি যে একটা হয়েছে তা দেখতে পাচ্ছি।

বেলাল হেসে বলল, কি। আমি খুব মোটা হয়ে গেছি, ফর্সা হয়ে গেছি।

না

তাহলে?

তুই অতিরিক্ত পারফিউম ইউজ করতে শিখেছিস।

বেলাল ঠা ঠা করে হেসে উঠল। তারপর পকেট থেকে মার্লবোরো সিগ্রেটের প্যাকেট বের করল।

মার্লবোরো চলবে?

নিজের সিগ্রেট তখন শেষ হয়নি বেলালের। টান দিয়ে বলল, না এই তো খাচ্ছি।

তোর ব্রান্ড কি?

বেনসান।

ও।

বেলাল সিগ্রেট ধরাল।

জাকি বলল, তুই হঠাৎ মার্লবোরো খেতে শুরু করেছিস কেন?

সিগ্রেটটা সব সময় পাবি না তো।

যে কদিন আছি স্টক আছে।

মানে?

মানে মাসখানেক থাকব, এতদিন নিজে খেতে পারব এমন সিগ্রেট আছে। তাছাড়া নিউমার্কেট এবং বায়তুল মোকাররমে মালকবরো পাওয়া যায়।

জাকি ভুরু কুঁচকে বলল, মাসখানেক পর কোথায় যাবি তুই?

কোথায় যাব মানে? আমি যে কুয়েতে থাকি তুই জানিস না?

না তো।

মানে?

মানে আবার কি? আমি জানি না, সত্যি জানি না তুই কুয়েতে থাকিস।

তাহলে কোথায় থাকি জানতি?

ঢাকায়।

ঢাকায় থেকে তোর সঙ্গে পাঁচ ছ বছর পর আমার দেখা হবে।

কেন হতে পারে না?

না।

পারে। আমরা সবাই নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি, বয়স, সংসার এসব কারণে তবু ঢাকা শহর খুব ছোট জায়গা। দেখা হতেই।

জাকি উদাস গলায় বলল, না ও হতে পারে।
বেলাল বলল, তুই আসলে একটা অদ্ভুত লোক।
জাকি সিগ্রেটে শেষ টান দিল। মানে?
পাঁচ ছ বছর তোর সঙ্গে আমার দেখা হয় না। তোর একবারও মাথায় এল না আমি দেশে আছি না বিদেশে। একবারও আমার খোঁজ নিলি না। আমাদের বাড়িটা তো নিশ্চয় ভুলে যাসনি?
না তা ভুলিনি।
তাহলে?
খোঁজ খবর নেয়া হয়নি, আসলে এত ব্যস্ত থাকি। মার সঙ্গে দেখা করতে পর্যন্ত যেতে পারি না।
তুই করিস কি এখন?
ওই যে ইনভেনটিংয়ের ব্যবসা।
কেমন চলছে?
খারাপ না।
কি রকম আর্ন করিস?
বছরে না মাসে?
মাসে।
চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা।
খুবই ভাল।
তুই আছিস কেমন?
ভালই।
বিদেশে থেকে কি কি উন্নতি করলি?
পাঁচ কাঠার ওপর একটা বাড়ি করেছি।
কোথায়?
বাড্ডায়।
ক তলা?
আর ক তলা?
মানে?
চার তলার ফাউনডেসান দিয়েছি।
হয়েছে কতটা?
একতলা পর্যন্ত হয়েছে।
তারপর?
টাকার অভাবে করতে পারছি না।
লোন নে।
দেখি।
বাড়ি ভাড়া দিয়েছিস?
না। নিজেই থাকছি।
নিজেই থাকছিস মানে?
বউ বাচ্চা থাকছে।
কেন তোদের বাড়ি?
বছর দুয়েক হল আলাদা হয়ে গেছি। ঝগড়াঝাটি

ও।
তারপর একটু থেমে জাকি বলল, আলাদা থাকাই ভাল। তাতে সম্পর্ক ভাল থাকে।
হ্যাঁ।
তোর ছেলেমেয়ে কটা?
দুটো।
ছেলে মেয়ে?
না দুটোই ছেলে। তোর?
এখন হয়নি। হব হব করছে। দোস্ত আমি ছেলে একদম পছন্দ করি না। আমি চাই আমার একটা মেয়ে হোক। আমি মেয়ে খুব পছন্দ করি।
আমিও। আজকালকার ভদ্রলোকদের অবশ্য দুটোর বেশি বাচ্চা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমি আর একটা এটেম্পট নেব। মেয়ের জন্য।
নে। নিয়ে ফেল। সংসারে মেয়েই যদি না থাকে তাহলে বাবাকে দেখবে কে।
হ্যাঁ।
হাতের সিগ্রেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। সিগ্রেটে শেষটান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল বেলাল।
জাকি বলল, তাহলে ওই বাড়িতে দুই বাচ্চা নিয়ে থাকছেন ভাবী?
হ্যাঁ। তবে তোর ভাবীর এক ভাইও থাকে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ও থাকাতে একটু সুবিধাও হয়েছে। বাড়িতে একজন পুরুষ মানুষ থাকা দরকার। ভাবীকে নিয়ে একদিন আয় না আমার ওখানে।
আপাতত আসতে পারব না দোস্ত।
কেন?
শাহিনের শরীর খারাপ।
কি হয়েছে?
বললাম না বাচ্চা হবে।
ও।
তারপর একটু থেমে বেলাল বলল, ক মাস?
দু মাস।
তাহলে বেরুতে পারবে না কেন?
প্রচন্ড বমি করছে।
সে তো সবাই করে।
ও একটু বেশি করছে, খুব দুর্বল হয়ে গেছে। স্যালাইন ফ্যালাইন দিতে হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন বেড রেস্টে থাকতে।
কতদিন বেড রেস্ট?
দিন পনর।
তারপর ঠিক হয়ে যাবে?
জাকি হাসল। ঠিক হয়ে যাবে কিরে। বাচ্চা না হওয়া অব্দি ঠিক হওয়ার উপায় আছে।
তারপর একটু থেমে জাকি বলল, তোর এখন কাজ কি?
কিছু না।
কোথায় যাচ্ছিলি?
বাসায়।

www.shopnil.com

তাহলে চল কোথাও বসে একটু চা খাই। এতকাল পর তোর সঙ্গে দেখা হল একটু গল্প টল্প করি।
চল।

চায়ে চুমুক দিয়ে জাকি বলল, কাল রাত থেকে এই পর্যন্ত দুটো অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।
বেলাল মাত্র চায়ে চুমুক দিতে যাবে, চুমুক না দিয়ে বলল, কি?
তারপর চায়ে চুমুক দিল।
জাকি বলল, একটি হচ্ছে তোর সঙ্গে হঠাৎ এতকাল পর দেখা হওয়া। আমরা ছেলেবেলার বন্ধু, এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পাঁচ ছ বছর দেখা হয় না। তুই বিদেশে থাকিস আমি জানিই না।
আর একটা?
আর একটা হচ্ছে কাল রাতে অদ্ভুত একটা টেলিফোন পেয়েছি।
কি রকম?
পৌনে বারটার দিকে টেলিফোনটা এল। ঢাকা থেকে নয়, ঢাকার বাইরে থেকে। এক ভদ্রলোক আমার নাম বলল, ফোন নাম্বার হুবুহু বলল, তারপর বলল আমাকে বেশ কদিন ধরে টেলিফোনে ট্রাই করছেন পাচ্ছেন না।
তারপর?
তারপর বলল, রেণুর খুব অসুখ।
কোন রেণুর?
আমিও তো রেণু নামের কাউকে চিনি না।
বলিস কি।
হ্যাঁ। যখন জিজ্ঞেস করলাম কোন রেণু সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে গেল। তারপর সারারাত আমি আর ঘুমোতে পারিনি। ওই ভদ্রলোকের টেলিফোনের জন্যে অপেক্ষা করেছি। আর ফোন আসেনি।
তুই ভদ্রলোক কিংবা রেণু কাউকে চিনিস না?
আরে না।
কথার ফাঁকে ফাঁকে দু'জনেরই চা শেষ হয়ে গেছে। জাকি পকেট থেকে সিগ্রেট বের করল। বেলালের দিকে এগিয়ে দিল। বেলাল বলল, না খাব না। বেনসান খুব লাইট।
তারপর মালকবরো বের করে ধরাল। জাকি ধরাল বেনসান।
বেলাল বলল, ফোনটা এসেছিল ঢাকার বাইরে থেকে?
জাকি বলল, হ্যাঁ।
তুই সিওর?
হ্যাঁ।
কি করে সিওর হচ্ছিস?
ভদ্রলোক বলল।
ভদ্রলোক তো মিথ্যেও বলতে পারেন।
মিথ্যে বলেন নি।
বুঝলি কি করে?

আরে দূর থেকে টেলিফোন এলে কথা শুনে বোঝা যায় না।
তা বোঝা যায়।
বেলাল কি রকম একটু চিন্তিত হল। চোখে আনমনা দৃষ্টি। পর পর দুবার সিগ্রেটে টান দিল সে। তারপর বলল, তুই ভেবে দেখেছিস রেণু নামের কাউকে আসলেই চিনিস না?
জাকি বলল, হ্যাঁ। সারারাতই তো ভাবলাম। রেণু নামের কাউকে আমি চিনি না। ওই নামে আমাদের কোন আত্মীয়ও নেই।
আচ্ছা রুবার কথা মনে আছে তোর?
জাকি কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই বেলাল বলল, আরে ব্যাটা আমাদের সঙ্গে বাংলায় পড়ত।
হ্যাঁ আবিদের সঙ্গে প্রেম ছিল।
কিন্তু পরে তোর সঙ্গে খুব খাতির হয়ে গিয়েছিল।
খাতির মানে বন্ধুত্ব আর কি। আমরা দুজন দুজনার কাছে ক্লিয়ার ছিলাম। রুবা আবিদের সঙ্গে প্রেম করত আমি করতাম শাহিনের সঙ্গে।
হ্যাঁ।
তারপর একটু থেমে বেলাল বলল, তোর শাহিনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, রুবার কিন্তু আবিদের সঙ্গে হয়নি।
কথাটা শুনে বেশ বড় রকমের একটা ধাক্কা খেল জাকি। বলিস কি। আবিদের সঙ্গে বিয়ে হয়নি রুবার।
না। কেন তুই জানিস না?
না।
সত্যি জানিস না?
আরে না।
রুবার সঙ্গে কতদিন দেখা হয় না তোর?
পাঁচ ছ বছর হবে। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরুবার পর আমি ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম, তারপর বিয়ে করলাম।
এসব তো সবাই করে, তাই বলে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা হবে না, যোগাযোগ থাকবে না।
আমার স্বভাবই তো এই রকম। বড় বেশি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তবে আমি জানতাম রুবা বিসিএস করছে, ওদের ফ্যামিলির অবস্থা ভাল ছিল না, চাকরি বাকরির চেষ্টা করছে। আবিদের সঙ্গে বিয়ে হবে আমি একদম কনফার্ম ছিলাম। কি শোনালি দোস্ত এতদিন পর।
ঠিকই শোনাচ্ছি। আরও অবাক হবি, রুবা এখন বিয়ে করেনি।
এ্যাঁ।
হ্যাঁ।
সে আছে কোথায়? শান্তিনগরে আগে যে বাসা ছিল।
না সেই বাসা অনেককাল আগেই ছেড়ে দিয়েছে ওরা। রুবা আর রুবার মা তো থাকত বড় ভাইর সঙ্গে। মা মারা যাওয়ার পর ঢাকার পাঠ চুকিয়ে চিটাগাংয়ে গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে রুবার বড় ভাই। বিসিএস করে মফস্বল কলেজে চাকরি নিয়ে চলে যায় রুবা।
এত ঘটনা আর আমি তার কিছুই জানি না।
এসটেতে সিগ্রেট গুঁজে বেলাল বলল, কি করে জানবি। তুই তো নিজেকে ছাড়া কিছুই বুঝিস না। কিন্তু রুবাকে আমি খুব ফিল করতাম দোস্ত। সেও আমাকে খুব ফিল করত। রুবার যদি আবিদ

www.shopnil.com

না থাকত, আমার যদি শাহিন না থাকত, তাহলে আমাদের জীবন অন্য রকম হতে পারত।
তোর জীবন তো ঠিকই আছে। শুধু রুবার
আচ্ছা রুবা এখন কোথায় আছে তুই জানিস?
জানি।
বল না।
বলে লাভ কি।
আমি রুবার ওখানে যাব।
এ্যাঁ?
হ্যাঁ।
বেলাল হেসে ফেলল। একথা তুই আমাকে বিশ্বেস করতে বলিস?
কয়েক মুহূর্ত বেলালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জাকি। সিগ্রেট ধরাল। তারপর বলল, বিশ্বেস করতে বলি। আমি রুবার সঙ্গে দেখা করতে যাব। দু এক দিনের মধ্যেই যাব। ইচ্ছে করলে তুইও আমার সঙ্গে যেতে পারিস।
আমার সময় নেই। মাত্র কদিন থাকব দেশে। ম্যালা কাজ আছে। তবে তুই আমার অনেক বড় একটা উপকার আজ করলি দোস্ত।
কি উপকার?
শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা কোন মানুষেরই উচিত নয়। বন্ধু বান্ধব প্রিয়জন এবং চারপাশের মানুষের দিকেও তাকাতে হয়। আমি এখন থেকে
তারপর একটু থেমে জাকি বলল, রুবার কথা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। দেশের যেখানেই থাক সে, যতো দূরেই থাক আমি রুবার সঙ্গে দেখা করতে যাব।
যা। রুবা তোকে দেখলে খুব খুশি হবে। খুবই ভাল মেয়ে, খুবই নরম মনের। ভাল মেয়েগুলোর ভাগ্য কেন যে এত খারাপ হয়। কেন যে এত দুঃখি হয়ে যেতে হয় তাদের। আবিদের সঙ্গে বিয়ে হল না বলে বিয়েই করল না রুবা। কোন মফস্বল শহরে গিয়ে পড়ে রইল।
আবিদের সঙ্গে বিয়েটা হল না কেন রে?
কারণটা আমি ঠিক জানি না। শুনেছি রুবাই নাকি আবিদকে মানা করে দিয়েছে।
এ্যাঁ।
হ্যাঁ।
অদ্ভুত ব্যাপার তো।
সঙ্গে সঙ্গে জাকির একটা হাত চেপে ধরল বেলাল। চাপা অদ্ভুত উত্তেজিত গলায় বলল, শোন রুবার আরেক নাম রেণু। রেণু নামে শুধু একজন লোকই ওকে ডাকত। ওর বাবা। অনেককাল আগে রুবা আমাকে একদিন বলেছিল।
জাকি ফ্যাল ফ্যাল করে বেলালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নাকফুল দেখে কিযে খুশি হল শাহিন। এইটুকু ছোট্ট একটা জিনিশ, কতক্ষণ ধরে যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, তুমি হঠাৎ করে নাকফুল নিয়ে এলে কেন?
প্রিয় মানুষের আনন্দ উচ্ছ্বাস দেখলে মন খারাপ করা মানুষেরও মন ভাল হয়ে যায়। জাকিরও হল। বলল, এখন তোমার নাকে যে নাকফুলটা আছে সেটা বেশ কালচে হয়ে গেছে।

তুমি তা দেখলে কখন?
আজই সকালেই প্রথম চোখে পড়ল।
তাই নাকি।
হ্যাঁ।
কিন্তু কই আমার তো মনে পড়ে না তুমি আজ সকালে একবারও আমার মুখের দিকে তাকিয়েছো।
জাকি বলল। কি যে বল। কতবার তোমার মুখের দিকে তাকালাম।
কি জানি, আমি দেখতে পাইনি।
তোমার কাছে যতক্ষণ থাকি আমি কেবল তোমার মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকি।
শাহিন বসেছিল বিছানায়। তার পাশে জাকি। জাকির কথা শুনে মুখটা জাকির গলার কাছে গুজে দিল শাহিন। এক হাতে জাকির গলা আকড়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে জাকির কেন যে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সেই দীর্ঘশ্বাস টের পেল না শাহিন। ভালবাসার একান্ত মুহূর্তে অনেক কিছুই টের পায় না মানুষ।
শাহিন বলল, তুমি একটু বস আমি নাকফুলটা পরে আসি।
যাও।
শাহিন বিছানা থেকে নেমে বাথরুমের দিকে চলে গেল। ঠিক তখুনি জাকির মনে ছিল রুবার কথা। রুবার আরেক নাম রেণু। শুধুমাত্র একজন লোক রেণু নামে ডাকত তাকে। তার বাবা। বেলালের মুখে কথাটা শোনার পর থেকে ভেতরে ভেতরে ভারি একটা অস্থিরতার মধ্যে আছে জাকি। কাল রাতের টেলিফোনের সঙ্গে কি তাহলে রুবার কোন সম্পর্ক আছে। রুবাকে কি রেণু নামে অন্য কেউ ডাকে। সেই মানুষটিই কি টেলিফোন করেছিল জাকিকে। রুবারই কি অসুখ। রুবার অসুখের কথাই কি জাকিকে জানাতে চাইল কেউ। ভদ্রলোক জাকির টেলিফোন নাম্বার পেলেন কোথায়! রুবার কাছে! জাকির টেলিফোন নাম্বার তো রুবার জানার কথা নয়। পাঁচ বছর রুবার সঙ্গে তার দেখা হয় না। কোন যোগাযোগ নেই। তাহলে।
অনেকগুলো প্রশ্ন জট পাকিয়ে যায় জাকির মাথায়। জাকি এখন কি করবে। রুবা যে শহরে থাকে, যে কলেজে কাজ করে বেলালের কাছ থেকে সব জেনেছে জাকি। জাকি কি সেই শহরে যাবে। গিয়ে দেখে আসবে কেমন আছে রুবা। মাথার ভেতর জট পাকিয়ে থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর কি রুবার কাছে গেলে মিলে যাবে।
কখন যে শাহিন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি জাকি। টের পেল শাহিন যখন তার কাঁধে হাত রাখল এবং জাকি সামান্য চমকাল।
শাহিন বলল, কি হয়েছে তোমার?
জাকি বলল, কি হবে?
তাহলে অমন আনমনা হয়ে আছ কেন?
কোথায়?
আমার কাছে লুকোচ্ছ কেন? আমি এসে পাশে দাঁড়ালাম তুমি টেরই পেলে না।
শাহিনকে সাধারণত মিথ্যে বলে না জাকি। মিথ্যে বলতে কি রকম একটা ঘৃণা বোধ করে সে। এ জন্যে কথা ঘুরিয়ে দিল। শাহিনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, বাহ খুব সুন্দর লাগছে। চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে।
সঙ্গে সঙ্গে আগের প্রসঙ্গ ভুলে গেল শাহিন। মিষ্টি করে হাসল।
তোমার পছন্দ হয়েছে।

www.shopnil.com

তাহলে আমাকে একটু আদর করে দাও।
জাকি উঠে দাঁড়াল। তারপর গভীর মমতায় দুহাতে শাহিনের মুখটা তুলে ধরল। খানিক শাহিনের মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের কাছে চেপে ধরল শাহিনের মুখ।
শাহিন ফিসফিস করে বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে খুব ভালবাসি।
শাহিনের কথা শুনে কেন যে জলে চোখ ভরে এল জাকির।

জাকি বলল, কি হল উঠে গেলে কেন?
শাহিন মুখ বিকৃত করে বলল, খেতে ইচ্ছে করছে না। কেমন
কি?
তুমি খেয়ে নাও তারপর বলব।
ব্যাপারটা বুঝতে পারল না জাকি। শাহিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।
শাহিন হাসল। খাওয়ার সময় অনেক কথা বলা যায় না। তুমি খাও। আমি হাতটাত ধুয়ে আসছি।
এবার ব্যাপারটা বুঝল জাকি। নিশ্চয় বমি পাচ্ছিল শাহিনের। এজন্যে খেতে পারছিল না। সামান্য খেয়ে বেশির ভাগ খাবার প্লেটে রেখে উঠে গেল। খাবার সময় বমি শব্দটা উচ্চারণ করা খারাপ। অন্যের রুচি নষ্ট হয়ে যেতে পারে এজন্যে কথাটা জাকিকে সে বলল না।
ফিরে এসে জাকির পাশের চেয়ারে বসলো শাহিন।
পেয়ালা থেকে বড় এক টুকরো মাছ তুলে দিল জাকির প্লেটে। কাজটা এত দ্রুত করল শাহিন, জাকি কিছু বুঝতে পারল না। হা হা করে উঠল। দিলে কেন। আমার খাওয়া তো শেষ।
শাহিন মিষ্টি করে হাসল। খাও।
আমি খেতে পারব না।
আমি দিয়েছি, খাও।
কিন্তু আমার পেট তো ভরে গেছে।
তবু খাও। ভালবেসে দিলে কোন কিছু ফেরাতে হয় না। তুমি যদি ভালবেসে আমাকে বিষ তুলে দাও আমি তো তাও খেয়ে ফেলব।
কথাটা শুনে বুকের খুব ভেতরে কি রকম একটা ধাক্কা লাগল জাকির। কেন যে রুবার কথা মনে পড়ল। ভেতরে ভেতরে জাকি ঠিক করে রেখেছে রুবার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। শাহিনকে কখন মিথ্যে বলে না সে। রুবার ব্যাপারে মিথ্যে বলতে হবে। বলতে হবে ব্যবসার কাজে ঢাকার বাইরে যেতে হবে। এবং খাবার টেবিলেই কথাটা বলবে।
যখন বলার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখুনি শাহিনের এরকম কথা। ভেতরে ভেতরে কিযে এক অপরাধ বোধ আক্রান্ত করল জাকিকে। মাথা নিচু করে অন্যমনা ভঙ্গিতে মাছের টুকরোটা নাড়াচাড়া করতে লাগল জাকি।
শাহিন বলল, একদমই যদি খেতে ইচ্ছে না করে তাহলে রেখে দাও। জোর করে খাওয়ার দরকার নেই।
জাকি চোখ তুলে শাহিনের মুখের দিকে তাকাল। তুমি যে বললে।
বলেছি তো কি হয়েছে। পেট ভরে গেলে খাবে কি করে। রেখে দাও।
যে কোন ব্যাপারে শাহিন যে কি সহজ সরল। কত সহজে সব কিছু মেনে নেয়। এরকম একজন

মানুষকে কেমন করে মিথ্যে বলা যায়।
শাহিন বলল, তুমি অমন করছ কেন?
কি?
কি রকম আনমনা হয়ে আছ। খাওয়া শেষ হয়ে গেছে তবু হাত ধুতে উঠছ না। কি হয়েছে তোমার?
তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।
বল।
তারপর একটু থেমে শাহিন বলল, হাত ধুয়ে এসো। তারপর ওই রুমে বসে কথা বলব।
জাকি উঠে বেসিনে হাত ধুতে চলে গেল। শাহিন চলে এল এই বাড়িতে যে রুমে সে থাকে সেই রুমে। এসে কাত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। খানিক পর জাকি এসে বসল তার মাথার কাছে। একটা হাত জাকির কোলের ওপর রেখে শাহিন বলল, তুমি সিগ্রেট খেলে না? তুমি তো সিগ্রেটের গন্ধ সহ্য করতে পার না।
তাতে কি হয়েছে। ভাত খাওয়ার পর সিগ্রেট না খেলে খারাপ লাগবে না তোমার।
তা একটু লাগবে।
তাহলে খাও।
ঠিক আছে আমি বারান্দায় গিয়ে সিগ্রেট খেয়ে আসি।
না যেতে হবে না। তুমি এখানেই খাও।
তোমার অসুবিধা হবে না?
একটু তো হবেই।
তাহলে থাক।
না তুমি খাও। তোমার জন্যে প্রতিটি মুহূর্তে কত বড় এক অসুবিধা ভোগ করছি আমি। আর এ তো সামান্য।
কথাটা বুঝতে পারল না জাকি। বলল, বড় অসুবিধা মানে?
এই যে তোমার বাচ্চা
কথাটা খুবই আদুরে স্বরে বলল শাহিন। শুনে এমন লাগল জাকির, ভাত খাওয়ার পর সিগ্রেটের তীব্র নেশা হয়, সেই নেশার কথা মনে হল না তার। দুহাতে শাহিনের মাথাটা টেনে কোলের কাছে নিয়ে এল। মুখটা শাহিনের ঘাড়ের কাছে গুঁজে দিয়ে বলল, আমি বুঝতে পারিনি, আমি কখন বুঝতে পারিনি তোমার এত কষ্ট হবে। জানলে জানলে
মুখ ঘুরিয়ে জাকির মুখের দিকে তাকাল শাহিন। তুমি এত ছেলেমানুষ, এত ছেলেমানুষ তুমি। এই, পৃথিবীর প্রতিটি মেয়েরই তো এমন কষ্ট হয়। তাই বলে মা হবে না মেয়েরা। তোমার এত অপরাধ বোধ কেন।
তুমি যে বললে।
আমি তো বলবই। আমি তোমাকে এত ভালবাসি। তুমি আমাকে এত ভালবাসো। আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি ব্যাপার একে অন্যের সঙ্গে শেয়ার করছি। আমি তো চাইবো আমার এই কষ্টেরও শেয়ার করো তুমি। যদিও জানি এই কষ্টের শেয়ার পৃথিবীর অন্যকারুর পক্ষে করা সম্ভব নয়। তবু পেটে বাচ্চা আসার পর মেয়েরা কি রকম অভিমানী কি রকম দুঃখি কি রকম আনন্দিত কি রকম রাগী, সব মিলিয়ে অদ্ভুত একটা অবস্থার মধ্যে থাকে। প্রতিটি মুহূর্তে স্বামীর মনোযোগ মায়া আদর ভালবাসা এসব চায়। তুমি লক্ষ্য করেছ কনসিপ করার পর থেকে আমি তোমার জন্যে কি রকম আকুলি বিকুলি করি। তোমার জন্যে অস্থির হয়ে যাই। তোমাকে কাছে

www.shopnil.com

পেলে ছেলেমানুষের মত তোমাকে ধরে রাখি কিংবা ছুঁয়ে থাকি। ওই একটাই কারণ। সব জেনে বুঝেও আমি আমার এই কষ্টের শেয়ার তোমাকে দিতে চাই।
শাহিনের কথা শুনতে শুনতে কি রকম স্তব্ধ হয়ে গেছে জাকি। রুবাকে দেখতে যাওয়ার কথা এই মেয়েকে কেমন করে বলবে জাকি। জাকির জন্যে এই আকর্ষণ যার তাকে চার পাঁচ দিনের জন্যে ফেলে কেমন করে চলে যাবে সে।

রাতের বেলা শাহিন বলল, তুমি কি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ?
জাকি শুয়েছিল এই বাড়িতে শাহিন যে রুমে থাকে সেই রুমের বিছানায়। খানিক আগে রাতের খাওয়া শেষ করেছে তারা। খাওয়ার পর চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে জাকি আর শাহিন বসেছে ড্রেসিং টেবিলের সামনে। ঘুমোবার আগে সামান্য প্রসাধন করার অভ্যেস আছে শাহিনের। প্রথমে দাঁত ব্রাস করবে সে। তারপর মুখে রাতের বেলা ব্যবহার করার ক্রিম এবং শরীরে হালকা ধরনের পারফিউম।
এখন সেই কাজগুলোই করছে সে। নাইটি পরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসেছে। বসে মুখে খুবই যত্ন করে ক্রিম ঘষছে। ক্রিম ঘষার ফাঁকেই কথাটা জাকিকে বলল।
প্রথমে শাহিনের কথার জবাব দিল না জাকি। শাহিনের দিকে তাকিয়ে রইল।
শাহিন বলল, কি হল?
জাকি বলল, কি?
কথা বলছ না কেন?
কি বলব?
আমার প্রশ্নটির জবাব দাও।
কি জবাব দেব?
ওই যে বললাম তুমি কি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ?
জাকি মনে মনে স্থির করল বিষয়টি নিয়ে শাহিনের সঙ্গে এখন সে কথা বলবে। সত্য কথাই বলবে তবে মিথ্যের আশ্রয় সামান্য হলেও নিতে হবে তাকে। স্ত্রীর কাছে কত মিথ্যে কথাই তো বলতে হয় মানুষকে। ইচ্ছে না থাকলেও মানুষ কখন কখন স্ত্রীকে মিথ্যে বলতে বাধ্য হয়।
যেমন জাকি আজ হচ্ছে।
জাকি বলল, আসলে তোমার কাছে আমি কিছু লুকোচ্ছি না। এক ধরনের অপরাধ বোধে ভুগছি।
কি?
চার পাঁ দিনের জন্য আমার একটু ঢাকার বাইরে যাওয়া দরকার।
কোথায়?
কুষ্টিয়ায়।
কেন?
সেখানে আমার এক বন্ধু থাকে তার সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার।
পাঁচ ছ বছর দেখা হয় না। শুনলাম তার খুব অসুখ।
কার কাছে শুনলে?
তোমার নাকফুল কিনতে গিয়ে আমার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বেলাল। কুয়েতে থাকে। ছুটিতে এসেছে। ওর সঙ্গেও পাঁচ ছ বছর পর দেখা হল। বেলালই বলল।

তোমারা দু বন্ধু মিলেই কি তাকে দেখতে যাচ্ছ?
জাকি তারপর প্রথম মিথ্যেটা বলল। হ্যাঁ।
কবে যাচ্ছ?
কাল বা পরশু।
শাহিন চুপ করে রইল।
জাকি বলল, যাব কিনা ডিসাইড করতে পারছি না।
কেন?
তোমার শরীরের এই অবস্থা।
ততক্ষণে প্রসাধণ শেষ হয়েছে শাহিনের। ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে উঠে জাকির মাথার কাছে এসে বসল সে। আলতো করে হাত রাখল জাকির মাথায়। কি অসুখ তোমার বন্ধুর?
কি অসুখ তা জানি না।
বেলাল ভাই বলতে পারল না?
না।
তারপর একটু থেমে জাকি বলল, তবে আমার মনে হয় সিরিয়াস ধরনের কোন অসুখই হবে।
তোমার সেই বন্ধুর নাম কি?
এক মুহূর্ত কি ভাবল জাকি। তারপর বলল, বেণু।
এ্যাঁ।
হ্যাঁ। বেণু। বাংলায় পড়ত। এখন কুষ্টিয়ার ওদিককার একটি কলেজে পড়ায়।
বউ কি করে?
বেণু এখন ব্যাচেলার। বিয়ে করেনি।
কেন?
কি জানি?
প্রেমে ব্যর্থতা!
জাকি খুবই যত্নে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল। জানি না,
কেন জানবে না। তোমার এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
বেণুর একজনের সঙ্গে এফেয়ার ছিল। বিয়ে কেন হয়নি জানি না। পাঁচ বছর বেণুর সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। এবার দেখা হলে সব জেনে আসব।
শাহিন একটু চুপ করে থেকে বলল, আচ্ছা কাল রাতের অদ্ভুত একটা টেলিফোনের কথা বললে না তুমি।
কথাটা শুনে জাকি একটু চমকাল। কিন্তু ব্যাপারটা শাহিনকে বুঝতে দিল না। নির্বিকার গলায় বলল, হ্যাঁ।
টেলিফোনের ভদ্রলোক কার নাম বলেছিল?
রেণু।
রেণু নামের কাউকে তো তুমি চেন না বলছ।
হ্যাঁ।
আমার মনে হয় কি জান ভদ্রলোক আসলে রেণু বলেন নি, বেণু বলেছেন।
এ্যাঁ।
হ্যাঁ। তুমি তন্দ্রার মধ্যে ফোন ধরেছ তো, বুঝতে পারনি। বেণু নামটিই রেণু হয়ে গেছে।
শাহিনের কথা শুনে ভেতরে ভেতরে বেশ খুশি হল জাকি। সে তো সব জেনে বুঝেই রেণু

www.shopnil.com

নামটিকে বেণু বলে চালিয়ে দিচ্ছে শাহিনের কাছে। শাহিন এই ধরণের কথা বলুক তাই চাচ্ছিলো সে। তবু শাহিনের কথা শুনে খুবই পাকা অভিনেতার মত প্রচন্ড অবাক হওয়ার ভান করল জাকি। তারপর উত্তেজিত ভঙ্গিতে বিছানায় উঠে বসল। শাহিনের একটা হাত আকড়ে ধরে বলল, ঠিক ঠিক বলেছ তুমি। বেণুর অসুখের খবরই কেউ আমাকে দিতে চেয়েছে। আমি নিশ্চয় শুনতে ভুল করেছি। তুমি খুব সার্প মেয়ে। তুমি ঠিক ব্যাপারটা ধরেছ।

প্রশংসা শুনলে মেয়েরা মুহূর্তেই কাতর হয়ে যায়। শাহিনও হল।

আর এইসব মুহূর্তে শাহিনের গলার স্বর এমন আদুরে হয়ে যায়, প্রায় শিশুর মত আধো আধো গলায় কথা বলে সে।

এখন বলল। তুমি যাবে?

শাহিনকে বুকের কাছে টেনে আনল জাকি। তুমি কি বল।

যাওয়া উচিত। কিন্তু

কিন্তু কি?

চার পাঁচদিন তোমাকে না দেখে আমি থাকব কেমন করে।

তাহলে যাব না।

না।

তারপর একটু থেমে শাহিন বলল, একদিনে গিয়ে একদিনে ফেরা যায় না?

না তা যায় না।

গাড়ি নিয়ে গেলে।

না।

অমন হলে আমাদের একটা গাড়ি নিয়ে যেতে পারতে।

জাকির খুব সিগ্রেট ধরাতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু শাহিনের অসুবিধার কথা ভেবে ধরাল না। বলল, তাহলে যাওয়াটা বাদ দিই।

না সেটা ঠিক হবে না।

কেন?

অসুখটা নিশ্চয় খুব সিরিয়াস। নয়ত ওভাবে তোমাকে ফোন করত না। বেলাল ভাইয়ের কানেও কথাটা যেত না। এমনও হতে পারে বন্ধুটি তোমার মৃত্যুশয্যায়।

কে জানে।

জাকির মাথার চুল এলমেলো করে দিয়ে শাহিন বলল, তুমি যাও। তবে চার পাঁচ দিন নয়, দু তিন দিনের মধ্যে ফিরে এস।

কিন্তু তোমার শরীর।

আমার শরীরের তো তেমন কোন সমস্যা নয়। যা হচ্ছে এমন তো হবেই।

তোমাকে না দেখে এ কদিন থাকতে আমার যে খুব খারাপ লাগবে। আমার যে খুব কষ্ট হবে।

শিশুর মত দু'হাতে জাকির গলা জড়িয়ে ধরল শাহিন। বাচ্চা হওয়ার সময় আমি যদি মরে যাই তখন তুমি তাহলে থাকবে কেমন করে।

সঙ্গে সঙ্গে কপোট এক ধরনের রাগ দেখাল জাকি। গম্ভীর গলায় বলল, এই কথাটা আর কখন আমার সামনে উচ্চারণ করবে না।

কেন? বাচ্চা হওয়ার সময় অনেক মেয়ে মরে যায় না।

অনেক মেয়ে আর তুমি এক নও।

তাহলে আমি কি?

তুমি প্রথমে আমার প্রেমিকা। তারপর আমার স্ত্রী। কিছুকাল পর আমার সন্তানের মা।

শাহিন বলল, তুমি আজ আমার একটা কথা রাখবে?

কি?

বলো রাখবে?

রাখব।

তুমি তাহলে আজ আমার কাছে থাক। ও বাসায় যাওয়ার দরকার নেই। আজ সারারাত তোমার বুকের কাছে শুয়ে থাকব আমি। তাহলে যে কদিন তুমি আমাকে ছেড়ে থাকবে, আমার মনেই হবে না তুমি আমাকে ছেড়ে আছ।

দু'হাতে শাহিনের মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরল জাকি। শাহিনের ঘাড়ের কাছে মুখ গুঁজে দিয়ে বলল, থাকব।

স্টেশান থেকে বেরুতেই রিকশাঅলাদের চিৎকার। আসেন সাহেব, আসেন। আমার রিকশায় আসেন। কোথায় যাইবেন নিয়া যাই।

বহুকাল এই ধরণের ছোট শহরে আসা হয়নি জাকির। রিকশাঅলারা যে সোয়ারির জন্যে এতটা কাতর হয় জানা নেই তার। ঢাকায় তো ডেকে অনুরোধ করে এমনকি অতিরিক্ত পয়সা দিয়েও অনেক সময় রিকশা পাওয়া যায় না।

রিকশাঅলাদের হাকডাক বেশ ভাল লাগল জাকির। প্রথমেই কারু রিকশায় চড়ল না সে। খুবই আয়েশ করে একটা সিগ্রেট ধরাল।

তারপর সিগ্রেট টানতে টানতে রিকশাঅলাদের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। চার পাঁচজন রিকশাঅলা হবে। প্রত্যেকেই জ্বলজ্বল করে তাকাচ্ছে জাকির দিকে। কেউ কেউ কথাও বলছে। আসেন না সাহেব। দেরি করতাছেন কেন। আসেন।

একটি যুবক তো রিকশা একেবারে জাকির পায়ের কাছে এনেই দাঁড় করিয়েছে। মুখটা হাসিহাসি যুবকটির। ঢোলা ঢালা একটা গেঞ্জি পরে আছে আর খয়েরি রঙের লুঙি। মুখে দশ পনর দিনের দাঁড়ি গোঁফ। মাথায় ঝাকরা চুল। চোখ দুটি বেশ উজ্জ্বল। খানিক তাকিয়ে থাকলে যুবকটিকে ঠিক রিকশাঅলা মনে হয় না। মনে হয় ভদ্রঘরের ছেলে।

জাকি বলল, ঠিক আছে আমি তোমার সঙ্গেই যাব। তার আগে আমি তোমার কাছ থেকে কিছু কথা জানতে চাই।

রিকশাঅলা যুবক হাসি মুখে বলল, বলেন।

অন্যান্য রিকশাঅলাদের দিকে একবার তাকিয়ে কাঁধের ব্যাগটা যুবকের রিকশার পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল জাকি। সিগ্রেটে টান দিয়ে বলল, আমি এই শহরে নতুন এসেছি। আগে কখন আসিনি।

রিকশাঅলা যুবক হাসি মুখে বলল, আপনেরে দেইখাই বুঝছিলাম আপনে এই শহরে কোনদিন আসেন নাই। পয়লা আইছেন।

বোঝা যায়?

জ্বী বোঝা যায়। এখন বলেন কোথায় যাইবেন।

কোথায় যাব সেই জায়গাটার নাম আমি জানি না। তার আগে তুমি আমাকে বল, এই শহরে একটা মহিলা কলেজ আছে না?

www.shoboi.com

জ্বী আছে।
চেন?
কি কন, চিনুম না।
ওই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বাড়ি
জাকির কথা শেষ হওয়ার আগে রিকশা যুবক বলল, আবুল হায়াত সাহেব, তার বাড়িতে যাইবেন? আমি চিনি তো। ওঠেন রিকশায় ওঠেন।
জাকি বলল, না ঠিক প্রিন্সিপাল সাহেবের বাড়িতে নয়। ওই কলেজের অন্য একজন টিচারের বাড়িতে যাব আমি। কিন্তু তার ঠিকানা জানি না। প্রিন্সিপাল সাহেবের বাড়িতে গিয়ে আগে তার ঠিকানা নেব। তারপর
যার কাছে যাইবেন তার নাম কি?
এক ভদ্রমহিলা?
নামটা বলেন
নাম বললে তুমি চিনবে?
দেখি চিনি কি না।
রুবা হানফি।
হ রুবা আপা। চিনি। ওঠেন রিকশায় ওঠেন। রুবা আফার অন্য কোনখানে খুঁজতে হইব না। সে প্রিন্সিপাল সাহেবের বাড়িতেই থাকে।
কথাটা শুনে এত অবাক হল জাকি, মুখে কোন কথা জুটল না তার। পরপর দুবার সিগ্রেটে টান দিল সে। তারপর মন্ত্র-মুগ্ধের মত রিকশায় উঠে বসল।

বিশাল কলেজ গ্রাউন্ডের পাশ দিয়ে সরু সুন্দর একটি রাস্তা। এক পাশে কলেজ গ্রাউন্ডের দেয়াল অন্য পাশে মানুষের ঘরবাড়ি। দু'পাশ থেকেই রাস্তার ওপর এসে পড়েছে গাছপালার ছায়া। ঝিরঝিরে একটা হাওয়া আছে। এরকম হাওয়ায় মন ভাল হয়ে যায় মানুষের।
খানিক আগে আবার সিগ্রেট ধরিয়েছে জাকি। সিগ্রেটে টান দিয়ে রিকশাঅলা যুবককে বলল, মহিলা কলেজের টিচারকেও তুমি চেন ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত তো।
যুবক বলল, চিনার কারণ আছে।
কি কারণ?
প্রিন্সিপাল সাহেবরে আমি চিনি অনেকদিন ধইরা। ছোটবেলা থিকাই। আমরা বরিশালের লোক। আমার বাপ মইরা গেছে ছোটবেলায়। তখন থিকা আমার মায় প্রিন্সিপাল সাহেবের বাড়িতে কাজ করে। প্রিন্সিপাল সাহেব তখন বরিশালে ছিল।
তারপর?
তারপর যখন এইখানে চইলা আসেন আমারে আর আমার মারেও সঙ্গে নিয়া আসেন।
বল কি।
হ। আমি আর আমার মায় প্রিন্সিপাল সাহেবের বাড়িতেই থাকি। মায় তার বাড়ির বেবাক কাম কাইজ করে। হাট বাজার করি আমি আর বাকি সময়ডা রিকশা চালাই।
যুবকের কথা শুনে খুবই খুশি হল জাকি। উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, তাহলে তো আমার ভাগ্যটা খুব ভাল অচেনা একটা জায়গায় এসে তোমার মত একজনকে পেয়ে গেলাম।

জাকি সিগ্রেটে টান দিল। তোমার নাম কি?
যুবক বলল, বারেক।
তুমি কি বিয়ে করেছ?
বারেক লাজুক হাসল। জ্বী না।
তাহলে রিকশা চালাও কেন?
জ্বী।
না মানে সংসারে তো তুমি এবং তোমার মা। তুমি বললে তোমরা দু'জনেই প্রিন্সিপাল সাহেবের বাড়িতে থাক। খাওয়া দাওয়া নিশ্চয়
জ্বী স্যারের বাড়িতেই করি।
তাহলে তোমার রিকশা চালাবার দরকার কি।
বাড়িতে তেমন কাজ কাম নাই। সারাদিন বেকার বইসা থাকি। স্যারে রিকশা কিনা দিল বলল কিছুদিন চালা। চালাইয়া টেকা পয়সা জমা কর তারপর ইস্টিশানে একটা দোকান কইরা দিমু।
তার মানে প্রিন্সিপাল সাহেব খুবই ভাল লোক।
ভাল লোক মানি কি সাহেব, ফেরেশতা। ফেরেশতা। আইজ কাইল এমুন লোক হয় না।
ছেলেমেয়ে কজন তার?
ছেলেমেয়ে নাই।
এ্যাঁ?
জ্বী। রুবা আফায় এখানে আসার পর, রুবা আফায়ই স্যারের ছেলে মেয়ে। তারা দুইজনেই রুবা আফার লাইগা জান দিয়া দেন।
সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভেতর একটা জট খুলতে শুরু করল জাকির। সেদিন রাতের টেলিফোনটা কি তাহলে প্রিন্সিপাল সাহেবই করেছিল। বারেকের কথায় বোঝা গেল রুবাকে তিনি মেয়ের মত স্নেহ করেন। রুবাও কি প্রিন্সিপাল সাহেবকে বাবার মত শ্রদ্ধা সম্মান করে। যে কারণে রুবার বাবা যে নামে রুবাকে ডাকত প্রিন্সিপাল সাহেবও সে নামে ডাকেন।
সিগ্রেট শেষ হয়ে এসছিল, পর পর দু'বার সিগ্রেটে টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল জাকি। তারপর বলল, বারেক তোমাকে আর দু' একটি কথা জিজ্ঞেস করব?
বারেক বলল, জ্বী করেন
এই কলেজে চাকরি নিয়ে আসার পর থেকেই কি রুবা প্রিন্সিপাল সাহেবের বাড়িতে আছে?
জ্বী।
প্রিন্সিপাল সাহেব রুবাকে কি রুবা বলেই ডাকেন?
প্রথম দিকে ডাকত।
এখন কি নামে ডাকেন?
স্যারে ডাকেন রেণু আর বেগম সাহেবে ডাকেন রুবা।
জাকি বুঝে গেল তার অনুমান ঠিক। প্রিন্সিপাল সাহেবের সঙ্গে বাপ মেয়ের সম্পর্ক হয়ে গেছে রুবার। এ জন্যে রুবার বাবা যে নামে রুবাকে ডাকত প্রিন্সিপাল সাহেবও সে নামেই ডাকেন। এবং সে রাতের টেলিফোন প্রিন্সিপাল সাহেবই করেছিল।
তারপর হঠাৎ করেই যেন রুবার অসুখের কথা মনে পড়ল জাকির। জাকি বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। উতলা গলায় বলল, রুবার কি হয়েছে?
জ্বী?
রুবার নাকি খুব অসুখ।

www.shopnil.com

জ্বী।
কি অসুখ তুমি জান?
শুনছি হার্টের অসুখ।
এ্যাঁ।
হ। একদিন রাইতে ফিট হইয়া গেল। স্যারে আর আমি হাসপাতালে নিয়া গেলাম। পাঁচদিন হাসপাতালে ছিল।
এখন কি অবস্থা?
অবস্থা খুব একটা ভাল না। কলেজ থিকা ছুটি নিছে। সারাদিন শুইয়া থাকে। স্যারে আর বেগম সাহেবে দিন রাইত তার সেবা করে। রুবা আফায় আর আগের মতন নাই কি রকম শাদা মাছের মতন হইয়া গেছে। কিচ্ছু খাইতে পারে না। খাইলেই বমি কইরা ফালায়।
রুবার ভাইরা কেউ রুবাকে দেখতে আসেনি?
আপার তো দুই ভাই। একভাই আইছিল।
বড় ভাই?
না ছোটজন। রুবা আপারে ঢাকায় লইয়া যাইতে চাইছিল, আপায় যায় নাই। একদিন থাইকা আপার ভাইয়ে চইলা গেছে।
বারেকের কথা শুনে জাকি কি রকম আনমনা হয়ে গেল। ঠিক তখুনি পুরনো আমলের ছোটখাট জমিদার বাড়ি ধরনের একটি বাড়ির বিশাল কোলা গেটের সামনে এসে রিকশা থামাল বারেক।
এইটাই স্যারের বাড়ি।
জাকি একটু থতমত খেল। তারপর রিকশা থেকে নামল। হিপ পকেটে হাতদিয়ে মানিব্যাগ বের করে বলল, বারেক কত দিতে হবে তোমাকে?
বারেক মৃদু হাসল। কিছুই দিতে হবে না।
এ্যাঁ।
হ। স্যারের বাড়ির মেহমান আপনে, আপনের কাছ থেকে ভাড়া নিমু না।
আরে না। তা হয় না।
আপনে বাড়ির ভিতরে যান আমি আপনের ব্যাগ নিয়া আসতেছি।
কিন্তু ভাড়া নিচ্ছ না কেন।
বারেক হাসি মুখে বলল, আপনে যান।
তারপর জাকির ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বলল, ঠিক আছে আপনে আমার সঙ্গেই আসেন। আগে আপনেরে পৌঁছাইয়া দেই।
মানিব্যাগ হিপ পকেটে রেখে বারেকের পিছু পিছু বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল জাকি।

মাত্র বারান্দায় বেরিয়ে এসেছেন প্রিন্সিপাল সাহেব, জাকির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। ব্যাগ কাঁধে বারেক আছে সঙ্গে। সে কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই প্রিন্সিপাল সাহেবকে সালাম দিল জাকি।
সালামের জবাব দিয়ে জাকির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তিনি।
বারেক বলল, ইনি ঢাকা থেকে
বারেকের কথা শেষ হওয়ার আগেই জাকি বলল, আমার নাম জাকির হাসান।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে চশমা খুলল প্রিন্সিপাল সাহেব। উত্তেজিত হলে এমন করেন তিনি। চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলেন। তারপর উত্তেজিত গলায় নয়, গম্ভীর গলায় কথা বলতে শুরু করেন। তার মানে ঝট করে চোখ থেকে চশমা খুলে উত্তেজনা সামাল দেন।
এখনও তাই করেছে। ফলে গলার স্বর গম্ভীর। বলল, আমি আপনাকে বহুবার ফোন করেছি। এখান থেকে ঢাকায় লাইন পাওয়া খুবই কষ্টের। দু একদিন যাও পেয়েছি, রিঙ হয় কিন্তু ফোন কেউ ধরে না।
জাকি বিনীত গলায় বলল, আমার ফ্ল্যাটে কেউ নেই।
জ্বী।
মানে আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ। সে তার মায়ের বাড়িতে আছে। আমি সারাদিন বিজনেস নিয়ে ব্যস্ত। ফ্ল্যাট লক করা থাকে।
ও। ঠিক এরকম নয় আমি অন্যরকম কিছু অনুমান করেছিলাম। এজন্যে সেদিন অত রাতে, কি দুর্ভাগ্য দেখুন কথাই বলা হল না। লাইন কেটে গেল। কিন্তু আপনি এল কি করে। কোথায় খবর পেলেন। আমি তো রুবার নাম বলিনি। রেণু বলেছি। পরে শুনলাম রুবার রেণু নামটি আপনি জানই না।
জাকি মৃদু হাসল। পরদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। সে বুঝেছি বন্ধুটির নাম বেলাল।
আরে আপনি বুঝলেন কি করে।
রেণু মানে রুবা বলেছে বন্ধুদের মধ্যে তার রেণু নামটি কেবল বেলালই জানে।
তারপর বড় করে একটা হাপ ছাড়লেন প্রিন্সিপাল সাহেব। যাক আপনি যে শেষ পর্যন্ত খবর পেয়েছেন এবং এসে পৌঁছেছেন। আপনাকে যে চিঠি লিখব আপনার বাসা কিংবা অফিসের ঠিকানা জানি না। এদিকে রেণুর এই অবস্থা। রেণু বার বার আপনার কথা বলছে।
জাকি খুবই নরম গলায় বলল, স্যার আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করতে পারি।
কি?
দয়া করে আমাকে, আমাকে আর আপনি করে বলবেন না। আমি স্বাভাবিক হতে পারছি না। লজ্জা পাচ্ছি, আরষ্ট হয়ে থাকছি।
জাকির কথা শুনে কি যে খুশি হল প্রিন্সিপাল সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে জাকির কাঁধে হাত রাখলেন। হাসি মুখে বলল, এখন বুঝতে পারছি রেণু কেন বার বার তোমার কথা বলে।
বারেক এখন দাঁড়িয়ে আছে পাশে। বারেকের দিকে তাকিয়ে প্রিন্সিপাল সাহেব বলল, কিরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা ব্যাগ ভেতরে রেখে আয়। আরে এত আমার ছেলে। জাকি। এই বাড়িতেই থাকবে। মুহূর্তে ভেতরে চলে গেল বারেক। আর ঠিক তখুনি বারান্দায় এল প্রিন্সিপাল সাহেবের স্ত্রী। তিনি বুঝতে পার নি বারান্দায় তাঁর স্বামীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন পুরুষ। একটু থতমত খেল তিনি। মাথায় ঘোমটা তুলল। প্রিন্সিপাল সাহেব হাসি মুখে বলল, তোমার আর লজ্জা পেতে হবে না। এ কোন বাইরের লোক নয়। অসুখের পর থেকে তোমার মেয়ে যার নাম বলছে এই সেই জাকি। এক্ষুনি এল।
জাকি নামটা শুনে ঠিক প্রিন্সিপাল সাহেবের মতই খুশি হল ভদ্রমহিলা। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে গেল তাঁর। ওমা। তাই বল।
সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল জাকি।
প্রিন্সিপাল সাহেব বলল, দেখেছ কী ছেলে। আজকালকার দিনে এরকম ছেলে হয়। রেণুর মুখে শুনে আমি আগেই বুঝেছিলাম।
জাকি বলল, রুবা কোথায়?

www.shopnil.com

তার রুমেই আছে। তুমি যাও।
তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে প্রিন্সিপাল সাহেব বলল, ওকে একটু রেণুর রুমটা দেখিয়ে দাও। কালেক্ট কমিটির একটা মিটিং আছে, আমি মিটিংটা সেরে আসি।
প্রিন্সিপাল সাহেব বেরিয়ে গেল।

রুবার ঘরের পেছন দিকে বিশাল একটি জানালা। জানালাটি সম্পূর্ণ খোলা। সেই খোলা জানালা দিয়ে স্বচ্ছ গভীর নীল একটুকরো আকাশ দেখা যায়। জানালার সামনে ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছে রুবা। অপলক চোখে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।
রুবার ঘরের দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে পেছন থেকে রুবাকে খানিক দেখল জাকি। তারপর রুবার মুখটা দেখার জন্যে পাগল হয়ে গেল। হৃদয়ের গভীর থেকে ডাকল, রুবা।
সেই ডাকে মুহূর্তে চমকে উঠল রুবা। পাগলের মত ইজিচেয়ার থেকে নামল সে। তারপর ফিরে করুণ অসহায় এবং মায়াবি চোখ তুলে জাকির দিকে তাকিয়ে রইল। রুবার মুখ এবং চোখ দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল জাকি। নড়তে পারল না। কথা বলতে পারল না। অপলক চোখে সেও তাকিয়ে রইল রুবার দিকে।
প্রিয় কোন মানুষের মুখ দেখে বহুকাল এমন ধাক্কা খায়নি জাকি। কতকাল পর রুবাকে দেখছে সে। পাঁচ কিংবা ছ বছর। তারা ইউনিভার্সিটি থেকে বেরুল রুবা তখন অদ্ভুত সুন্দর। খুব একটা লম্বা নয় রুবা, ছোটখাট সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। শবরি কলার মত ছিল গায়ের রঙ। মুখটা অসম্ভব মিষ্টি। মাথায় সিলকের মত নরম মোলায়েম চুল। কোমর অব্দি লম্বা ছিল চুল কপালে লাল বড় একটা টিপ পরত। হাসি আনন্দে উচ্ছলতায় মেতে থাকত সারাক্ষণ। প্রচুর বন্ধুবান্ধব ছিল রুবার। জাকির সঙ্গে যখন পরিচয় তার অনেককাল আগ থেকেই আবিদ নামের এক যুবকের সঙ্গে প্রেম করত। আবিদের সঙ্গে বিয়ে হবে রুবার জাকির সঙ্গে পরিচয়ের তিন চার দিনের মধ্যেই কথাটা জেনে গিয়েছিল জাকি। রুবাই বলেছিল। এমন কি আবিদের সঙ্গে একদিন পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিল। ছেলেটিকে ভাল লাগেনি জাকির। অবশ্য ওই নিয়ে রুবার সঙ্গে কখন তার কোন কথা হয়নি। জাকি তখন পাগলপারা প্রেমে ডুবে আছে শাহিনের।
রুবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এসব কথা মনে পড়ছিল জাকির। সেই সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে রুবা তার একি চেহারা হয়েছে, একি শরীর হয়েছে। মাথার সেই অসাধারণ সুন্দর চুল কোথায় রুবার।
রুবার মুখটা মরা মাছের মত ফ্যাকাশে। শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেছে। মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে। রুবাকে আগে যারা দেখেছে তারা কেউ এই রুবাকে দেখে বিশ্বেস করবে না। রুবা যে রুবাই কারু তা মনে হবে না।
জাকির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ততক্ষণে জলে ভরে এসেছে রুবার চোখ। সেই চোখ দেখে রুবার দিকে তাকিয়ে থাকার ঘোর কেটে গেল জাকির। কি রকম গভীর দুঃখের গলায় জাকি বলল, কেমন আছ রুবা?
রুবা কথা বলল না। মাথা নিচু করে চোখের জল সামলাল?
জাকি বলল, আমি জানতাম না। আমি তোমার সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। ভেবেছিলাম বিয়ে টিয়ে করে সংসার করছ তুমি। সুখে আছ। এক রাতে হঠাৎ একটা টেলিফোন এল। রেণু নাম শুনে আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। তারপর লাইনটা গেল কেটে। পরদিন দেখা হল বেলালের

সঙ্গে। কথায় কথায় তোমার কথা জানলাম আমি। তারপর বেলালের কাছ থেকেই ঠিকানা জোগাড় করে
জাকি একটু থামল। তারপর বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিন্তু তোমার এরকম মুখ দেখতে হবে জানলে আমি কিছুতেই তোমার কাছে আসতাম না। তোমার যে মুখ আমার চোখে লেগে আছে সেই প্রিয় মুখটিই আমার চোখ জুড়ে থাকত।
চোখ তুলে জাকির দিকে তাকাল রুবা। খুবই নরম মায়াবী গলায় বলল, পথে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে, না?
জাকি বলল, না আমার কোন কষ্ট হয়নি।
হয়েছে।
কি করে বুঝলে?
তোমার মুখ দেখে। তোমার মুখটা খুব শুকিয়ে গেছে। তবে তুমি আগের মতই আছ তোমার কোন চেঞ্জ হয়নি। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এখন ইউনিভার্সিটির ছাত্র তুমি। বরং আগের তুলনায় তোমাকে আর ইয়াং লাগছে। তুমি আর সুন্দর হয়ে গেছ।
রুবা কথা বলছিল বেশ আস্তে আস্তে। টেনে টেনে। রুবার কথা বলার ফাঁকে জাকি টের পেয়ে গেল একটানা কথা বলতে এক ধরনের কষ্ট হয় রুবার।
কেন যে রুবার এই কষ্টটা নিজের বুকের খুব গভীরে টের পেল জাকি।
রুবা বলল, তুমি আসবে আমার কিছুতেই তা বিশ্বেস হয়নি।
জাকি বলল, বিশ্বেস না হবারই কথা। এতকাল কোন যোগাযোগ নেই। তবে প্রথমে টেলিফোন তারপর বেলালের মুখে তোমার সব কথা শুনে তোমার মুখটা দেখার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম আমি।
গভীর মায়াবী চোখ তুলে জাকির মুখের দিকে তাকাল রুবা। সত্যি।
সত্যি। অমন না হলে কি এভাবে ছুটে আসি।
এসে যে কি ভাল করেছ।
মানে?
তোমার সঙ্গে জীবনে শেষবারের মত দেখাটা হল।
কি বলছ?
হ্যাঁ। আমার দিন তো শেষ হয়ে এল।
বাজে কথা বল না। তোমার অসুখ ভাল হয়ে যাবে।
তুমি বলছ?
হ্যাঁ।
তুমি বলছ না তোমার মন?
আমার মন বলছে।
তোমার মন কেন যে বলে। আমাকে দেখার পরও কেন যে তোমার মন বলে।
রুবা একটু থামল। তারপর বলল, অবশ্য তোমার মুখটা দেখার পর আমার এখন মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমার কোন অসুখ নেই। আমি একদম ভাল হয়ে গেছি। ইউনিভার্সিটি জীবনের মত, তুমি মোটর সাইকেলের পেছনে বসিয়ে কতদিন বাড়ি পৌঁছে দিয়েছ আমাকে আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে এখুনি তোমার মোটর সাইকেলের পেছনে বসে, একহাতে তোমার কোমর জড়িয়ে ধরে বহু দূরের কোন নির্জন রাস্তায় তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারব আমি।
রুবার কথা শুনে ভেতরে ভেতরে কি রকম অচেনা একটা অনুভূতি হচ্ছিল জাকির। রুবা যে

www.shopnil.com

এমন করে কখন কথা বলেনি জাকির সঙ্গে। জাকির সঙ্গে রুবার তো শুধু বন্ধুত্বই ছিল। অন্য কিছু নয়ত। তাহলে।

রুবা বলল, আমার কথা শুনে তুমি খুব অবাক হচ্ছো না?

জাকি আমতা গলায় বলল, না মানে

আমি চাইছিলাম, আমি চাইছিলাম তোমার সঙ্গে আমার দেখা হোক। দেখা না হলে এই জীবনে আমার সেই না বলা কথাটি যে তোমাকে বলা হবে না। আর তোমাকে সেই কথা না বলে কেমন করে মরে যাব আমি। মরেও যে তাহলে আমার কোন শান্তি থাকবে না।

রুবা আমি ঠিক তোমার কথা

মানে আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ না এই তো। বুঝবে। আমি তোমাকে সব বলব, সব বুঝিয়ে বলব। এত দূর জার্নি করে এসেছ, চল আমি তোমাকে তোমার রুম দেখিয়ে দিই। গোসল করে ফ্রেস হও। চা টা খাও। তারপর, তারপর আমি তোমাকে সব বলব।

টেবিলে কত রকমের খাবার যে সাজান হয়েছে। সন্ধের মুখে মুখে এত রকমের খাবার কেমন করে খায় মানুষ।

টেবিলের দিকে তাকিয়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল জাকির। খানিক আগে গোসল করেছে সে। তারপর জলপাই রঙের ডোরাকাটা একটা ট্রাউজার পরেছে। ট্রাউজারের ওপর থ্রি কোয়ার্টার হাতার ঠিক ট্রাউজারের মতই একটা বেশ ঢোলাঢালা গেঞ্জি। বুকের কাছে লেখা নিউইয়র্ক। অর্থাৎ দুটো মিলে একটি পোশাক সেট। খোকন নিউইয়র্ক থেকে পাঠিয়েছিল। এটা ঘরে পরে থাকার পোশাক। পোশাকটিতে অদ্ভুত মানিয়েছে জাকিকে। বাথরুমে ঢুকে সেভ করেছে সে। তারপর সাবান শ্যাম্পু দিয়ে বেশ অনেকক্ষণ ধরে গোসল করেছে। গোসল করার পর জাকির স্বভাব হচ্ছে শরীরে বডি স্প্রে করা। ব্রুট তার খুব প্রিয়। ব্রুটের আফটার সেভ বডি স্প্রে সাবান এবং শ্যাম্পু সবই ব্যবহার করে সে। এখন করেছে। ফলে শরীর থেকে ব্রুটের মনোরম পুরুষালি গন্ধে চারদিক ভরে যাচ্ছিল।

জাকি খাবার টেবিলে এসে বসার আগেই রুবা এসে বসেছিল। বারেক খাবার টাবার এনে রাখছিল। কিচেন থেকে বারেকের মা সব ঠিকঠাক করে পাঠাচ্ছিল।

জাকিকে দেখে মুগ্ধ চোখে জাকির দিকে তাকিয়ে রইল রুবা।

জাকি বলল, কি দেখছ?

রুবা একটু থতমত খেল। তারপর বলল, তোমাকে।

রুবার পাশের চেয়ারে বসে জাকি বলল, আমাকে?

হ্যাঁ।

আমাকে দেখার কি হল?

তুমি খুব সুন্দর হয়ে গেছো।

এ্যাঁ।

হ্যাঁ। কি যে সুন্দর হয়ে গেছ তুমি। তোমাকে দেখে একটা কথা আজ বিশ্বেস করলাম আমি।

কি কথা?

পুরুষমানুষরা, মানে কোন কোন পুরুষমানুষ ধীরে ধীরে সুন্দর হয়। বিধাতা তাদের সৌন্দর্য আস্তে ধীরে ফুটিয়ে তোলেন। তুমি সেই সৌন্দর্যের আওতায় পড়েছ।

জাকি ঠাট্টার স্বরে বলল, আর মেয়েরা।

জাকির ঠাট্টা খেয়াল করল না রুবা। বলল, মেয়েদের সৌন্দর্যের যেটুকু দেয়ার কৈশোর থেকেই দিয়ে দেন বিধাতা। দ্রুত দেন বলে দ্রুতই তাদের সৌন্দর্য ফিরিয়ে নেন। তোমার এখন যে বয়সে

এই বয়সে কোন মেয়ে সাধারণত সুন্দর হয় না। এই সময় তাদের সৌন্দর্য ঝরতে থাকে।

কোন কোন মেয়ে কিন্তু এই বয়সেও সুন্দর হয়।

তাদের সংখ্যা খুব কম।

তারপর যেন হঠাৎ করেই মনে পড়েছে এমন স্বরে রুবা বলল, আরে আমি যে শুধুই কথা বলে যাচ্ছি, কথা বলে যাচ্ছি। তুমি খাওনা, খাও। তোমার নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে।

জাকি সুন্দর করে হাসল তা পেয়েছে।

খাও।

কিন্তু এত কিছু কি করে খাব।

একটু একটু করে খাও। যেটা ভাল লাগবে, মানে বেশি ভাল লাগবে সেটা বেশি খাবে।

একটা কোয়ার্টার প্লেটে গাজরের হালুয়া তুলে জাকির দিকে ঠেলে দিল রুবা। এটা দিয়ে শুরু কর।

গাজরের হালুয়াটা প্রথমে খেয়াল করেনি জাকি। হঠাৎ করে দেখে কি যে খুশি হল। মুখটা মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে গেল তার। গাজরের হালুয়া। বাহ। জান আমি গাজরের হালুয়া খুব পছন্দ করি।

রুবা গম্ভীর গলায় বলল, জানি।

কি করে জানলে?

অনেককাল আগে আমাদের বাসায় আমি তোমাকে একদিন গাজরের হালুয়া খেতে দিয়েছিলাম। সেদিনও তোমার মুখটি এই মুহূর্তের মত উজ্জ্বল হয়েছিল।

জাকি খুবই অবাক হল কবে?

অনেককাল আগে। তোমার সঙ্গে তখন মাত্র পরিচয় হয়েছে আমার। বিকেলবেলা কি মনে করে আমাদের বাসায় গিয়ে হাজির হয়েছিলে তুমি। আমি তোমাকে গাজরের হালুয়া খেতে দিয়েছিলাম।

আমার কিন্তু মনে নেই।

আমার কোন কিছু কি তোমার মনে ছিল।

জাকি একটু থতমত খেল। তারপর মৃদু হেসে বলল, থাকবে না কেন।

না নেই।

কি করে বুঝলে?

তোমার মুখ দেখে আমি বুঝতে পারছি তুমি অনেক কিছু ভুলে গেছ। অবশ্য ব্যাপারটা এমন সূক্ষ্ম ছিল তোমার মনে থাকার কথাও নয়।

জাকি ফ্যাল ফ্যাল করে রুবার মুখের দিকে তাকাল। মানে?

থাক এখন শুনতে হবে না। আমি তোমাকে বলব। সব বলব।

কখন?

পরে। তুমি এখন খাও।

চামচে করে প্লেট থেকে গাজরের হালুয়া তুলে মুখে দিল জাকি।

তারপর বলল, তুমি খাচ্ছ না কেন?

কি খাব?

এই যে এত খাবার।

আমি এসব খাবার খুব একটা খাই না। মানে খেতে পারি না

তাহলে?

আমার এখন স্যুপ খাওয়ার সময়।

www.shopnil.com

কি স্যুপ?
চিকেন।
স্যুপটা এখানে দিতে বল। আমার সঙ্গে বসে খাও।
স্যুপ বোধহয় এখন তৈরি হয়নি।
কে তৈরি করছে? বারেকের মা?
না।
তাহলে?
আমার মা।
মানে?
মানে আমার মা।
আমি তো জানি তোমার মা
আমার আর একজন মা আছ এখানে। বাবা আছ।
জাকি হাসল। বুঝতে পেরেছি।
স্যুপ করে মা নিজ হাতে আমাকে খাইয়ে দেবেন। তাঁর হাতে না খেলে আমার পেট ভরে না।
তোমার অসুখটা আসলে কি?
বলব তো, এত তাড়াহুড়ো করছো কেন? আচ্ছা শোন, তুমি কদিন থাকবে না আমার কাছে?
কথাটা এমন মায়াবী স্বরে, এমন ভালবাসার গলায় বলল রুবা, শুনে বুকের ভেতর কেমন করে উঠল জাকির। শাহিনের ব্যাপারটা মুখে এসে গিয়েছিল। কি ভেবে নিজেকে সামলাল সে। গভীর গলায় বলল, থাকব।
সঙ্গে সঙ্গে মুখটা কিযে উজ্জ্বল হয়ে গেল রুবার। জাকি বুঝতে পারল না এতকাল পর, দেখা হওয়ার পর থেকে তার জন্যে এ কেমন আকুলতা রুবার। বন্ধুর জন্যে এমন আকুলতা কি থাকে মেয়েদের। পুরুষবন্ধুর জন্যে। ইউনিভার্সিটির সহপাঠির জন্য।
জাকির আর খেতে ভাল্লাগছিল না। রুবাকে বলল, চা দাও।
কথাটা শুনে চমকে উঠল রুবা। কেন, এখুনি চা খাবে কেন? আর একটু কিছু খেয়ে নাও।
খেতে ইচ্ছে করছে না।
কেন?
পেট ভরে গেছে।
এইটুকু খেয়ে পেট ভরে গেল।
হ্যাঁ। এ সময় খুব বেশি কিছু খেতে পারি না আমি।
জাকি নিজেই টি পটের দিকে হাত বাড়াল।
রুবা বলল, দাঁড়াও আমি দিচ্ছি।
কাপে চা ঢেলে খুব যত্ন করে জাকির চা বানিয়ে দিল রুবা।
চায়ে চুমুক দিয়ে জাকি বলল, স্টেশনে নেমেই অলৌকিকভাবে বারেককে পেয়ে গেলাম জান।
রুবা নরম গলায় বলল, জানি।
কি করে জানলে?
বারেক বলেছে।
কখন বলল?
তুমি যখন বাথরুমে।
আচ্ছা শোন, আমি যে হঠাৎ করে এভাবে তোমার কাছে চলে এসেছি, প্রিন্সিপাল সাহেব তাঁর স্ত্রী

আর বাড়ির লোকজন কে কি ভাববে বল তো।
কি ভাববে?
কত কি ভাবতে পারে না। আমি কে, তোমার সঙ্গে কি সম্পর্ক আমার।
তোমার সঙ্গে আমার যে কি সম্পর্ক মা বাবা দু'জনেই তা জান। বাবাই তো তোমাকে টেলিফোন করেছিল। বাবাকে নয়, প্রথমে মাকেই আমি সব বলেছিলাম। মা বাবাকে বলেছেন।
কি?
রুবা কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই স্যুপের বাটি হাতে প্রিন্সিপাল সাহেবের স্ত্রী এল। জাকির দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, মেয়ের জন্যে স্যুপ করতে গিয়েছিলাম।
তারপর টেবিলের দিকে তাকিয়ে অবাক হল তিনি। একি কিছুই তো খাওনি?
চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে জাকি বলল, খেয়েছি।
কোথায় খেলে। সবই তো রয়ে গেছে।
এত কি খাওয়া যায় খালাম্মা। তবে প্রচুর খেয়েছি। গাজরের হালুয়াটা খুব ভাল লাগল।
রুবা বলল তুমি খুব পছন্দ কর, তাড়াহুড়ো করে করলাম। এখানকার ঘিটা খুব ভাল। বোধহয় এজন্যে তোমার বেশি ভাল লেগেছে।
রুবার পাশের চেয়ারে বসলেন তিনি। তারপর রুবার দিকে তাকিয়ে বলল, হাত দিয়ে খাবে না আমি খাইয়ে দেব।
রুবা এক পলক জাকির দিকে তাকাল। তারপর লাজুক গলায় বলল, আমি হাত দিয়ে খাব?
সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল জাকি। না না আপনি খাইয়ে দিন খালাম্মা। হাত দিয়ে খেলে আমার মনে হয় সে কিছুই খাবে না। আমি বরং ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসি।
রুবা বলল, ড্রয়িংরুমে নয় তুমি বরং আমার রুমে যাও। আমার রুমের সঙ্গের বারান্দায় চেয়ার পাতা আছে। ওখানে গিয়ে বস। আমি আসছি।
জাকি কোন কথা বলল না। রুবার রুমের দিকে চলে গেল।

রুবার ঘরের পেছন দিককার বারান্দাটা খুব সুন্দর। বাড়িটা পুরনো আমলের। তবে জমিদার বাড়ি ধরনের বাড়ি বলে প্রতিটি ব্যাপারের মধ্যেই বেশ বনেদীআনা আছে। উঁচু সুন্দর বারান্দায় কাঠের বেশ চমৎকার গ্রীল দেয়া। গভীর কাল রঙের বার্নিস দেয়া গ্রীল। বারান্দার পরই পরিষ্কার ছিমছাম কিন্তু বেশ কয়েক কাঠার ওপর সুন্দর একটি বাগান। কত যে ফুলের গাছ বাগানে। বারান্দার রেলিংয়ের ঠিক সঙ্গেই চার পাঁচটা হাসনুহেনার ঝোঁপ। ফুলে ফুলে ছেঁয়ে আছে ঝোঁপগুলো। সন্ধে হয়ে গেছে বলে তীব্র গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে হাসনুহেনা।
বারান্দায় এসে মনটা কি রকম ভাল হয়ে গেল জাকির। ট্রাউজারের পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করল সে। লাইটার বের করল। তারপর সিগ্রেট ধরিয়ে চেয়ারে বসল।
বারান্দায় তিনটে বেতের চেয়ার পাতা। আর একটি টেবিল। চেয়ারগুলোর আছে সুন্দর গদি। বসতে বেশ আরাম সেই চেয়ারে বসে সামনের বাগানের দিকে তাকিয়ে রইল জাকি। তাকিয়ে কি রকম আনমনা হয়ে গেল। রুবার আচরণ এবং এক ধরনের রহস্যময় কথাটথা রুবার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই অবাক করে দিচ্ছিল জাকিকে। রুবা কেন এমন করছে। কি হয়েছে তার। শরীরের অসুখের সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতরও কি কোন অসুখ দেখা দিয়েছে তার। কিংবা মাথায় হয়েছে সুক্ষ্ম কোন গণ্ডগোল। রুবার সঙ্গে এভাবে দেখা করতে এসে বড় রকমের কোন ভুল

www.shopnil.com

করল না তো জাকি।
তারপর জাকির খুব শাহিনের কথা মনে পড়তে লাগল। কি অদ্ভুত সরল মেয়ে শাহিন। ভুলেও কখন কল্পনা করবে না তাকে অনেক কিছু লুকিয়ে একদার সহপাঠিনীর সঙ্গে এভাবে দেখা করতে এতদূর চলে এসেছে জাকি।
জাকি এক ধরনের অপরাধ বোধ করতে লাগল। ঠিক তখুনি তার পাশে এসে দাঁড়াল রুবা।
অন্ধকারে চারদিক ভরে এসেছে। রুবার মুখটা আবছা দেখতে পাচ্ছিল জাকি। কিন্তু চোখ দেখতে পাচ্ছিল না। তবু রুবার চোখের দিকে তাকাল জাকি। বলল, বস।
রুবা কথা বলল না। জাকির পাশের চেয়ারে নরম ভঙ্গিতে বসল।
জাকি বলল, খাওয়া হল?
রুবা মুখ ঘুরিয়ে জাকির দিকে তাকাল। হয়েছে।
তারপর একটু থেমে বলল, খেতে আমার একদম ভাল লাগে না জাকি।
না খেলে শরীর ভাল হবে কি করে।
এখন কিন্তু খেয়েছি।
মানে?
পুরোটা স্যুপ খেয়ে ফেলেছি।
তাই।
হ্যাঁ। মা তো অবাক। আমি কখন একসঙ্গে এতটা স্যুপ খেতে পারি না। খাওয়ার পর বেশ ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে আমার কোন অসুখ নেই। মাও তাই বলল।
কি বলল?
বলল এভাবে খেতে পারলে শরীর দ্রুত সেরে উঠবে।
আমারও তাই মনে হয়।
এসবের কারণ কি জান?
কি?
তুমি।
মানে?
তুমি এসেছ, তোমাকে দেখেই অর্ধেক ভাল হয়ে গেছি আমি। আমার কোন অসুখ আছে মনেই হচ্ছে না। স্বাভাবিক মানুষের মত খাচ্ছি, হাঁটাচলা করছি, অবিরাম তোমার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছি। এসবের কিছুই তো অনেককাল ধরে করা হয় না আমার। আমি খেতে পারতাম না। বমি করে ফেলতাম। দু পা হাঁটলে পা ভেঙ্গে আসত আমার। খানিক কথা বললে হাঁপাতে শুরু করতাম। তোমাকে দেখার পরও তেমন হচ্ছিল। কিন্তু যতোটা সময় গেল, তোমাকে যতোটা দেখলাম, কথা বললাম, এতই ভেতরে ভেতরে আশ্চর্য এক শক্তি জেগে উঠতে দেখছি। চার পাঁচদিন তুমি আমার কাছে থাকলে আমি পুরোপুরি সেরে উঠব। আমার কোন অসুখ থাকবে না।
রুবার কথা শুনে ভেতরে ভেতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে জাকি। সিগ্রেট টানতে টানতে আনমনা হয়ে গেছে। সেই প্রশ্নগুলো আবার ফিরে এসেছে মনের ভেতরে। কি হয়েছে রুবার। জাকিকে নিয়ে যে রকম বাড়াবাড়ি সে করছে, সহপাঠি বন্ধুর জন্যে কোন মেয়ে কি এমন করে। প্রেমিক কিংবা স্বামীর জন্যেও তা আজকালকার আধুনিক মেয়েরা এতটা কাতরতা দেখায় না। যতকাল পরই তার সঙ্গে দেখা হোক।
সিগ্রেটে শেষ টান দিয়ে সিগ্রেটটা ছুড়ে ফেলে দিল জাকি। তারপর বলল, তোমার অসুখটা আসলে কি রুবা?

রুবা গভীর গলায় বলল, আমার অসুখ হচ্ছ তুমি।
কথাটা বুঝতে পারল না জাকি। সামান্য থতমত খেল সে। বলল, এ্যাঁ।
হ্যাঁ। তুমি ছাড়া আমার কোন অসুখ নেই।
রুবার মুখের দিকে তাকাল জাকি। চোখের দিকে তাকাল। অন্ধকারে মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না রুবার। চোখ দেখা যাচ্ছে না। তবে জাকি অনুমান করল রুবা তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে।
ভেতরে ভেতরে প্রচন্ড অবাক হল জাকি। এতটা অবাক বহুকাল হয়নি সে। ফলে গলা কি রকম রুদ্ধ হয়ে এল জাকির।
জড়ানো গলায় বলল, কি বলছ রুবা।
রুবা বলল, হ্যাঁ। আমার অসুখ হচ্ছ তুমি।
জাকি কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই রুবা বলল, খুবই কাতর এবং নরম গলায় বলল, শুধু অসুখ নয় আমার জীবনের যেটুকু সুখ সেও তুমি।
পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করল জাকি, লাইটার বের করল। তারপর আবার সিগ্রেট ধরিয়ে বলল, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।
কি বুঝতে পারছ না। আমি তো সব স্পষ্ট করেই বললাম। এরচে স্পষ্ট করে কোন মেয়ে কি বলে।
তবু আমি কিছু বুঝতে পারছি না।
বুঝতে পারছ না, না বুঝতে চাইছ না।
বুঝতে পারছি না।
তাহলে যা যা না বুঝতে পারছ, একটা একটা করে প্রশ্ন কর আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিই।
কোন কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। আমি কেন তোমার অসুখ হতে যাব। আমি কেন তোমার সুখ হতে যাব। তুমি বললে আমার কথা তোমার বাবা মা অর্থাৎ প্রিন্সিপাল সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী সব জান। প্রিন্সিপাল সাহেবের স্ত্রীকে তুমি সব বলেছ। মানে আমার ব্যাপারে সব বলেছ। এবং তিনি বলেছেন প্রিন্সিপাল সাহেবকে। যে কারণে তিনি আমাকে অবিরাম টেলিফোন করেছ কিন্তু পেয়েছেন এক গভীর রাতে। তাও কথা শেষ হওয়ার আগে লাইন কেটে গেল। বেলালের মুখে সব শুনে আমি তোমাকে দেখতে এসেছি। আসার পর থেকে লক্ষ্য করছি আমার সঙ্গে অদ্ভুত আচরণ করছ কথা কোন কিছুই বুঝতে পারছি না।
জাকি সিগ্রেটে টান দিল।
রুবা বলল, কথা শেষ হয়েছে তোমার?
হ্যাঁ।
আর কিছু বলবে না আমি বলব।
তুমি বল। আমি তো তোমার কাছে এসবের কারণ জানতে চাইছি।
তার আগে তোমাকে আমি একটি কথা জিজ্ঞেস করি।
কর।
বাবার টেলিফোন এবং বেলালের মুখে শুনে তুমি কোন টানে হঠাৎ এমন করে আমাকে দেখার জন্যে ছুটে এলে। পাঁচ ছ বছর তোমার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। সম্পর্ক নেই। আমার ধারণা তুমি আমার কথা মনেই রাখোনি।
মনে রাখিনি তা নয়। ইউনিভার্সিটি জীবনের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে তোমার সম্পর্কে কথা টথা হত। আমার মত অনেকেই জানে আবিদের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে। তুমি ঢাকায় নেই। অন্য কোথাও আছ। এই তো। বেলালের কাছে সব জানার পর এবং তোমার অসুখের কথা শুনে তোমার মুখটা দেখার জন্যে অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম আমি। শাহিনের শরীর খারাপ। সে কনসিভ করেছে। অন্যরকমের একটু প্রবলেম হয়েছে বলে বেড রেস্টে থাকতে হচ্ছে তাকে। সে আছে তার মায়ের কাছে। এই ফাঁকে তোমার কথা শুনে

www.shopnil.com

কথা শেষ করল না জাকি। সিগ্রেটে টান দিল।
রুবা বলল, তোমাকে একটা অনুরোধ করব।
কি?
যে কদিন আমার এখানে থাকবে শাহিনের কথা একবারও আমাকে বলবে না।
কেন?
তোমার মুখে অন্য কোন মেয়ের নাম শুনতে আমার ভাল লাগে না। বুকের মধ্যে কেমন করে।
ভেতরে ভেতরে আবার বেশ বড় রকমের একটা ধাক্কা খেল জাকি। তবু নিজেকে সামলাল।
বলল, শাহিন অন্য কোন মেয়ে নয়। শাহিন আমার স্ত্রী।
আমি তা জানি। জানি বলেই বলছি।
কিন্তু আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না রুবা।
এখন বুঝতে পারছ না?
না।
আর কিভাবে আমি তোমাকে বোঝাব। কেমন করে বলব, আমি তোমাকে, আমি তোমাকে
কথা শেষ করতে পারল না রুবা। হু হু করে কাঁদতে লাগল। আর রুবার মুখে ওটুকু শুনে, রুবাকে অমন করে কাঁদতে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল জাকি। হাতের সিগ্রেট পুড়ে যাচ্ছে, সিগ্রেটে টান দেয়ার কথা একবারও মনে হল না তার।

প্রিন্সিপাল সাহেব বলল, ডাক্তারদের কথা শুনে আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম। একজন মানুষের কথা ভাবতে ভাবতে কারু হার্টের প্রবলেম হতে পারে, রাতের বেলা হঠাৎ করে সেন্সলেস হয়ে যেতে পারে সে এবং তারপর এমন অসুস্থতা, একটানা পাঁচদিন হাসপাতালে তারপর কলেজ ছুটি নিয়ে অনেকদিন বাড়িতে, কিছুতেই সুস্থ হয় না মেয়ে, এ কেমন কথা। তার ওপর মানুষটি কে তাও আমরা কেউ জানি না। তোমার খালাকে বললাম যেমন করে হোক মেয়েটির মুখ থেকে সেই মানুষটির নাম জান। সেই মানুষের সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে। ব্যাপারটা বুঝতে হবে আমাকে। তারপরই তোমার কথা জানতে পারলাম।
প্রিন্সিপাল সাহেবের ড্রয়িংরুমে প্রিন্সিপাল সাহেবের মুখমুখি সোফায় বসে আছে জাকি। এখন বেশ রাত। খাওয়া দাওয়া শেষ করে প্রিন্সিপাল সাহেবের স্ত্রী এবং রুবা শুয়ে পড়েছে। প্রিন্সিপাল সাহেবের অভ্যেস হচ্ছে রাত জেগে পড়াশুনো করা। আজ আর তা করেননি তিনি, ড্রয়িংরুমে বসে জাকির সঙ্গে কথা বলছেন।
জাকি মাথা নিচু করে বসে আছে। রুবার সঙ্গে ওসব কথা হওয়ার পর থেকে মনের ভেতর প্রচন্ড এক ঝড় চলছে তার। এতকাল পর, জীবন এতদূর গড়িয়ে যাওয়ার পর একি কথা রুবা আজ বলল। জাকির কথা ভাবতে ভাবতে নিজেকে কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে রুবা। মৃত্যুর মুখে পৌঁছে গেছে। এমন ঘটনা কি ঘটে জীবনে। গল্প উপন্যাসেও তো এমন দেখা যায় না।
জাকির খুব সিগ্রেট খেতে ইচ্ছে করছিল। পকেটে সিগ্রেটের প্যাকেট এবং লাইটার আছে। কিন্তু প্রিন্সিপাল সাহেবের সামনে সিগ্রেট ধরানো বেয়াদবি হবে।
প্রিন্সিপাল সাহেব বলল, আমার কলেজে চাকরি নিয়ে আসার পর কোথা দিয়ে কেমন করে মেয়েটি যে আমাকে আমার স্ত্রীকে
কথা শেষ না করে থামল তিনি। তারপর বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমি নিঃসন্তান মানুষ। সন্তানের জন্যে বিশাল এক হাহাকার আমার এবং আমার স্ত্রীর। মেয়েটি সেই হাহাকার ভুলিয়ে দিল। এই বয়েসে অতবড় মেয়েটিকে, যেন সে সদ্য জন্মেছে আর আমরাও যেন নব দম্পতি, সংসারে প্রথম সন্তান এসেছে এমন করে মেতে উঠলাম ওকে নিয়ে। যেমন আমি তেমন

আমার স্ত্রী। রুবাকে তার বাবা ডাকত রেণু নামে। আমিও সেই নামে তাকে
কথা বলতে বলতে গলা কেমন ধরে এল প্রিন্সিপাল সাহেবের। খানিক চুপ করে থেকে নিজেকে সামলালেন তিনি। তারপর বলল, সেই মেয়ের এই অসুখ। আমরা দিশেহারা হয়ে গেলাম। তারপর রেণুর কাছ থেকে আস্তে ধীরে তোমার কথা জেনে নিলেন আমার স্ত্রী। অথচ এতকাল মেয়েটি আমার কাছে আছে কখন তার পেছনের জীবন নিয়ে কিছু বলেনি। মা ভাইদের কথা বলেছে। বাবার কথা বলেছে। আর কিছু না। বিয়ে কেন করেনি, এই বয়সি মেয়েকে যে কোন মুরব্বি ধরনের লোকেই তা জিজ্ঞেস করব। প্রথম দিকে আমার স্ত্রীও করেছিল, প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেছে রেণু। কিন্তু তার মনের মধ্যে যে লুকিয়ে আছে এই রহস্য, যা দিনকে দিন তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিচ্ছে সেই কথা কাউকে সে বলেনি। ডাক্তার বলল চাপা স্বভাবের জন্যেই এমন অসুখ হয়েছে তার।
জাকি মুখ তুলে প্রিন্সিপাল সাহেবের দিকে তাকাল। গভীর নরম গলায় বলল, স্যার আপনি কি আমার সম্পর্কে কিছু জান?
প্রিন্সিপাল সাহেব বলল, কিছুটা জানি।
কি?
তুমি বিবাহিত।
আর কিছু।
না তেমন আর কিছু জানি না। রেণু তো খুব চাপা স্বভাবের মেয়ে।
সবকিছু বোধহয় আমার স্ত্রীকে সে খুলে বলেনি।
আমি কি আপনাকে সব বলব স্যার।
নিশ্চয়। বল।
রুবার ব্যাপারটি আমার
জাকির কথা শেষ হওয়ার আগেই দরোজার সামনে থেকে রুবা ডাকল, বাবা। সেই ডাকে জাকি চমকে উঠল আর প্রিন্সিপাল সাহেব উঠল তটস্থ হয়ে। দ্রুত উঠে দাঁড়াল তিনি। তারপর দরোজার কাছে এগিয়ে গেল। কিরে মা তুই উঠে এসেছিস কেন। শরীর খারাপ লাগছে। কোন অসুবিধা হচ্ছে।
রুবা নরম গলায় বলল, না।
তাহলে?
ঘুম আসছিল না। আমি জানি আপনি এখন জেগে আছ। আপনার স্টাডি রুমে গিয়ে দেখি আপনি নেই। দেখি ড্রয়িংরুমে আলো জ্বলছে।
হ্যাঁ জাকির সঙ্গে কথা বলছিলাম।
আমি আপনার কাছে থাকি বাবা।
থাক মা।
গভীর মমতায় রুবাকে বুকের কাছে এক হাতে চেপে ধরল প্রিন্সিপাল সাহেব। তারপর রুবাকে নিয়ে আস্তে ধীরে হেঁটে সোফায় বসল প্রিন্সিপাল সাহেবের পাশে। প্রিন্সিপাল সাহেব এক হাতে তখন জড়িয়ে রেখেছেন রুবাকে। দৃশ্যটি দেখে কি রকম এক অনুভূতি যে হল জাকির। গভীর কিন্তু সম্পূর্ণ অচেনা এক বেদনাবোধে চোখ ছলছল করে উঠল তার। খানিক আগে যে কথা সে প্রিন্সিপাল সাহেবকে বলতে চেয়েছিল, ভুলে গেল।
বোধহয় প্রিন্সিপাল সাহেবও আগের প্রসঙ্গ সব ভুলে গেছেন। বলল, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে পিতা হলাম জাকি। কিন্তু রেণু যে আমার আপন মেয়ে নয়, আমি যে ওকে জন্ম দিইনি একথা কিন্তু একবারও আমার মনে হয় না। মনে হয় আমার খুব ছোট্ট একটি মেয়ে, ছোটবেলায় কাউকে কিছু না বলে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন পর আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে। মেয়ের অভাবে বুকটা সম্পূর্ণ খালি হয়েছিল আমার। মেয়ে ফিরে আসার পর বুক ভরে

www.shopnil.com

গেছে।
রুবা বলল, কিন্তু বুক তো আপনার আবার খালি হয়ে যাবে বাবা।
কথাটা বুঝতে পারল না প্রিন্সিপাল সাহেব। বলল, কেন খালি হবে?
আমি তো থাকব না।
কোথায় যাবি তুই?
আপনি বুঝতে পারছেন না বাবা কোথায় চলে যাব আমি।
সঙ্গে সঙ্গে রুবার মুখের দিকে তাকাল প্রিন্সিপাল সাহেব। জাকি বুঝে গেল পরিবেশ যতটুকু ভারি হয়েছিল এখন তারচেও ভারি হবে। প্রিন্সিপাল সাহেব এবং রুবা দু'জনেই হয়ত কাঁদতে শুরু করবে। সেই কান্না দেখে জাকি নিজেও হয়ত কাঁদবে। ব্যাপারটা এড়াবার জন্যে জাকি বলল, কি বলছ রুবা। কেন বাবাকে কষ্ট দিচ্ছ। যা শুনলাম তাতে আমার মনে হয় না খুব বড় রকমের কোন অসুখ তোমার হয়েছে। ভাল ট্রিটম্যান্ট হলে খুব সহজেই সেরে উঠবে তুমি।
রুবা কোন কথা বলল না। চোখ তুলে জাকির দিকে তাকিয়ে রইল।
প্রিন্সিপাল সাহেবও জাকির দিকে তাকাল। নিশ্চয় সেরে উঠবে। আর ভাল ট্রিটম্যান্ট না হওয়ার তো কোন কারণ নেই। এখানে না হলে ঢাকায় নিয়ে যাব। ঢাকায় না হলে নিয়ে যাব মাদ্রাজের ভেলোরে। আমার একটি মাত্র মেয়ে। সারাজীবনের সঞ্চয় আমার খুব একটা কম নয়। সেই সঞ্চয়ের পুরোটা আমি আমার মেয়ের জন্যে ব্যয় করব।
রুবার মাথায় পিঠে হাত বুলাতে লাগল প্রিন্সিপাল সাহেব। সেই দৃশ্য দেখে নিজেকে কি যে অপরাধী মনে হল জাকির। রুবার এই অসুখের জন্যে সে দায়ি এ কথা ভেবে বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল জাকির।
ঘুম ভেঙ্গে রুবার মুখটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল জাকি। মুখটা বেশ সতেজ হয়ে গেছে রুবার। কি রকম ঝকমক করছে মুখ। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে আছে।
সকাল বেলা উঠেই গোসল করেছে রুবা। চওড়া পারের আকাশি রঙের টাঙ্গাইলের পাট ভাঙা শাড়ি পড়েছে। শরীর থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ আসছিল তার। যুবতী শরীরের এরকম গন্ধে মন ভাল হয়ে যায় যে কোন পুরুষের। জাকিরও হল। ঘুম ভাঙা মুগ্ধ চোখে রুবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। রুবার এই মুহূর্তের মুখ দেখে কে বলবে হৃদয়ে ভয়ংকর এক অসুখ নিয়ে বেঁচে আছে সে। কাল রাতেও মৃত্যুর কথা বলেছে।
রুবা বলল, কি হল উঠবে না।
জাকি বিছানায় উঠে বসল। হাতের চায়ের কাপ জাকির দিকে এগিয়ে দিল রুবা। নাও।
জাকি কথা বলল না। হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিল। চায়ে চুমুক দিল।
রুবা বলল, এত সকালে আমার কখন ঘুম ভাঙে না জান। আজ ভেঙেছে।
জাকি বলল, কেন?
তোমার জন্য।
তারপর একটু থেমে বলল, রাতের বেলা আমার আসলে ঘুমই হয়নি। বাবার সঙ্গে কথা বলার পর তুমি তোমার রুমে চলে গেলে, আমি আমার রুমে। তারপর আমার আর ঘুম আসে না। কেবল তোমার কথা মনে হয়। কেবল তোমার কাছে
কথাটা শেষ করল না রুবা। কি রকম লজ্জা পেয়ে গেল।
রুবার মুখের দিকে তাকিয়ে জাকি বলল, আমারও রাতের বেলা একদম ঘুম হয়নি।
আমাকে তাহলে ডাকলে না কেন।
অত রাতে তোমাকে ডাকা কি ঠিক হত।
কেন ঠিক হত না। সবাই তো জানে।
জাকি গম্ভীর গলায় বলল, সবাই কি জানে রুবা?
তুমি বোঝনি কি জানে।

জাকি চায়ে চুমুক দিল। আমি তোমার মুখ থেকে সব শুনতে চাই।
শোন।
আজই শুনতে চাই। এখুনি।
আর দু একটা দিন যাক।
কেন?
আমি আর একটু ভাল হয়ে নিই।
তুমি তো এখুনি ভাল হয়ে গেছ। তোমার মুখ দেখে আমার মনেই হচ্ছে না তোমার কোন অসুখ আছে।
রুবা মিষ্টি করে হাসল। আমারও তাই মনে হচ্ছে। এসব কেন জান।
তোমার জন্য। তোমার কথা ভেবে সারারাত ঘুম হয়নি আমার। অসুখ। তবু সকাল বেলা উঠে গোসল করলাম। নিজ হাতে তোমার জন্য চা বানালাম। তারপর থেকে নিজেকে কি যে ফ্রেস লাগছে। আর দু একটা দিন যাক দেখবে আমি একদম ভাল হয়ে গেছি। তখন আমি তোমাকে সব বলব। যতক্ষণ তুমি আমার কাছে থাকবে, আমার চোখের সামনে থাকবে, যতক্ষণ ইচ্ছে করলেই আমি তোমাকে স্পর্শ করতে পারব, ততক্ষণ, ততদিন আমি কেবলই সুস্থ হব।
চা শেষ হয়ে গেছে। কাপটা নামিয়ে রেখে জাকি বলল, কিন্তু আমাকে তো ফিরতে হবে।
তুমি যে বললে চার পাঁচদিন থাকবে।
তা না হয় থাকব। কিন্তু তোমার এ আচরণ আমার একদম ভাল লাগছে না। আমি কখন কোন রহস্যময়তার মধ্যে থাকতে পারি না। রহস্য হেয়ালি এসব আমি পছন্দ করি না। কিন্তু এখানে আসার পর থেকে তুমি আমার সঙ্গে তাই করে যাচ্ছ। আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছি না। রাতের বেলা প্রিন্সিপাল সাহেব অনেক কিছু বলল। যখন আমি বলতে গেলাম ঠিক তখুনি তুমি চলে এলে। আমার কথা বলা হল না। কিন্তু প্রিন্সিপাল সাহেবের কথা শুনে বোঝা গেল তিনি বা তাঁর স্ত্রী যতটুকু জেনেছেন, মানে তুমি তাঁদেরকে যা জানিয়েছ তার মধ্যে বড় রকমের একটা ফাঁক রয়ে গেছে।
হ্যাঁ ফাঁক একটা আছে। ভাগ্যিস তুমি কথা শুরু করবার আগেই আমি কাল রাতে বাবার কাছে পৌঁছে গিয়ে ছিলাম।
তুমি আমাকে পরিষ্কার করে বল তুমি তাঁদেরকে কি বলেছ।
ওসব কথা তো বাবাকে বলা যায় না, মেয়ে হয়ে কেমন করে বাবাকে ওসব বলি। আমি বলেছিলাম মাকে।
কি বলেছ?
তোমার কথা। আমি তোমাকে, তোমার জন্যে আমার এই অসুখ, তুমি বিবাহিত
জাকি হঠাৎ করে কেমন একটু রেগে উঠল। কেন বললে, কেন তুমি মিথ্যে বললে।
মিথ্যে আমি বলিনি।
কিন্তু তোমার সঙ্গে তো আমার, তোমার তো আবিদের সঙ্গে, আমি তো আসলে শাহিনকে আবিদের কথা মাকে আমি বলিনি।
কেন, কেন? তুমি তো তাকেই ভালবাসতে, তোমার তো তার সঙ্গেই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। ঢাকায় আমার পরিচিত সবাই তাই জানত। তুমি জানতে, আমার ভাইরা জানত। আমিই সবাইকে জানিয়ে ছিলাম। তখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। পরিচয় হয়নি। কিন্তু দেখা হওয়ার পর, তোমাকে জানার পর ভেতরে ভেতরে আমি তোমাকে, কিন্তু তুমি শাহিনের জন্য, আমি আবিদের জন্য, আমরা দু'জনে এমনই জেনেছিলাম। তুমি শাহিনকে সত্যিকারের ভালবাস কিন্তু আবিদের সঙ্গে আমার যা ছিল সে কিছুতেই সত্যিকার প্রেম নয়। হয়ত কোন একটা আবেগ হয়ত বয়সের দোষ। তেমন না হলে তোমাকে দেখার পর আমার সবকিছু অমন করে উল্টে যাবে কেন। সত্যিকার প্রেমে কি এমন হয়। কই তোমার সঙ্গে শাহিনের তো হয়নি। নিজেকে বোঝার

www.shopnil.com

পর আমার অনুভূতি নানা রকম ভাবে তোমাকে আমি বোঝাতে চেয়েছি। তুমি শাহিনে মগ্ন। আমাকে বুঝতে পারনি। সব জেনে আমিই বা তোমাকে সরাসরি কেমন করে বলি।

রুবা একটু থামল। তারপর বলল, শাহিনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গেল। আমি তোমার বিয়েতে যাইনি। সে ছিল আমার জীবনের সব চাইতে কষ্টেরদিন। ও রকম কষ্টের কথা মানুষ মানুষকে বোঝাতে পারে না। আমিও তোমাকে বোঝাতে পারব না।

রুবার কথা শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে জাকির। আনমনে সিগ্রেট ধরাল সে রুবা বলল, তোমার বিয়ের পর ভাবলাম সবাই যা জেনেছে তাই সত্য হোক। আবিদকেই বিয়ে করে ফেলি। কদিন খুব ভাবলাম। তারপর ডিসাইড করলাম, এ কেমন করে সম্ভব। কদিন ঘর করব একজনের, সন্তান ধারণ করব একজনের, সারাটা জীবন কাটাব একজনের সঙ্গে আর প্রতিটি মুহূর্ত ভাবব আরেকজন মানুষের কথা, এ হয় না। তখুনি একদিন তোমার সঙ্গে দেখা হল। তোমার মনে আছে কিনা কে জানে, জার্মান কালচারাল ইনসটিটিউটে। আমাদের একটা কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান। তোমার বিয়ের পর তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। তোমার সঙ্গে তোমার স্ত্রী ছিল না। কিযে সুন্দর লাগছিল তোমাকে সেদিন। একেবারে ঝকঝক করছিলে। তোমার সেই সৌন্দর্য আমি সইতে পারিনি। দর্শকদের দেয়ার জন্যে আমার হাতে ছিল একগাদা গোলাপ। টকটকে লাল। কোন কথা না বলে তোমার হাতে সবগুলো ফুল দিয়ে চলে এসেছিলাম আমি। তারপর আবিদকে দিলাম সরাসরি মানা করে। চাকরির ব্যবস্থা আগেই হয়েছিল। এখানে চলে এলাম। তারপর থেকে আমার দিন কেটেছে তোমার কথা ভেবে। রাত কেটেছে তোমার কথা ভেবে। সেই কষ্টের কথা, তোমার কথা কাউকে আমি বলতে পারিনি। দিনে দিনে অসুখ হয়ে গেল। যখন মরতে বসেছি তখন একজন মানুষকে অন্তত না বলে আমার কোন উপায় ছিল না। সে আমার মা। প্রিন্সিপাল সাহেবের স্ত্রী। তারপর কথাটা গেল বাবার কানে। তোমার টেলিফোন নাম্বার বছর দুয়েক আগে আমি জেনেছি। মার মাধ্যমে বাবা সেই টেলিফোন নাম্বার জেনে নিলেন। মাকে আমি বলেছিলাম তোমার সঙ্গে আমার একবার অন্তত দেখা হওয়া উচিত। আমার মনের কথাটি তোমাকে আমি বলে যেতে চাই। মনের কথা মনে রেখে কেমন করে মরে যাব আমি। তুমি যে এসেছ, বেলালের মুখে আমার কথা শুনে তুমি যে এসেছ এরচে বড় কোন পাওয়া আমার জীবনে নেই। এখন মরে যেতেও আমার কোন কষ্ট হবে না। রুবা হু হু করে কাঁদতে

সারাটা দিন তারপর কিযে এক কষ্টে কাটে জাকির। ঘুরে ফিরে প্রতিটি মুহূর্তে কেবলই রুবার কথা মনে হয়। ভেতরে ভেতরে নিজের এ কোন সর্বনাশ করে বসে আছে সে। এ কেমন করে হয়। রুবা কেন এমন করল। সব জানার পর অদ্ভুত এক অপরাধ বোধে আক্রান্ত হয়ে আছে জাকি। একের পর এক সিগ্রেট খেয়েছে। বুঝতে পারেনি তার এখন কি করা উচিত। বেশ কবার রুবা এসে তার রুমে ঘুরে গেছে। দুপুরে খাবার টেবিলেও দেখা হয়েছে। কিন্তু জাকি তেমন কোন কথা বলেনি। কি রকম বিষণ্ন হয়ে থেকেছে। ভেতরে ভেতরে প্রচন্ড রাগ করেছে নিজের সঙ্গে। বেলালের মুখে রুবার কথা শুনে অতটা ইমোশনাল সে না হলেও পারত। কি দরকার ছিল হুট করে এভাবে এখানে চলে আসার। রুবার ব্যাপারটি অজানা ছিল অজানাই থাকত সারাজীবন।

কিন্তু সকাল বেলা জাকির সঙ্গে কথা হওয়ার পর থেকে রুবা আছে অদ্ভুত এক আনন্দের মধ্যে। সারা বাড়ি ফুর ফুর করে ঘুরছে। এটা করছে ওটা করছে। বেশ শব্দ করে কার সঙ্গে যেন দুবার কথা বলল। নিজের রুমে বসে কয়েক বারই রুবার জলতরঙ্গের মত হাসির শব্দ পেল জাকি। আর রুবার এরকম প্রাণবন্ত ভাব দেখে বাড়িতে কি রকম একটা উৎসবের ছোঁয়া লেগে গেছে যেন। খাবার টেবিলে বসে প্রত্যেকের মধ্যেই এক ধরনের আনন্দের ভাব লক্ষ্য করল জাকি।

www.shopnil.com

এসব কেন। রুবার উচ্ছলতার কারণে, হৃদয়ের অসুখ সেরে যাচ্ছে রুবার, এই কারণে।

নিজের রুমে বসে এসব ভাবছে জাকি, বিকেল বেলা, রুবা এসে ঢুকল। হালকা ঘি রঙের চমৎকার শাড়ি পরেছে। লাল এবং সোনালির মিশেল দেয়া ওড়া সুন্দর পার শাড়ির। তীব্র লাল রঙের ব্লাউজ পরেছে, ঠোঁটে লাল লিপস্টিক, কপালে, জাকির সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিককার মত বেশ বড় গোল লাল টিপ। পিঠময় খোলা চুল রুবার। মুখে সামান্য প্রসাধন। রুমে এসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রুবার গা থেকে ভেসে আসা অদ্ভুত গন্ধে রুম ভরে গেল জাকির। এই ধরনের সুগন্ধে জাকির মন দ্রুত ভাল হয়ে যায়। এখন হল। রুবার দিকে তাকাল জাকি। তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল।

অদ্ভুত উচ্ছ্বাসের গলায় রুবা বলল, কেমন লাগছে?

জাকি বিষণ্ন গলায় বলল, ভাল।

কি রকম ভাল?

খুব ভাল।

তাহলে তুমি অমন করে বলছ কেন?

কেমন করে বলছি।

কি রকম বিষণ্ন গলায়। কাউকে দেখে ভাল লাগলে মানুষ যে রকম উচ্ছ্বাসিত হয় তুমি তেমন হচ্ছ না।

আমার মন ভাল নেই।

কেন গো।

সকাল বেলা তোমার মুখ থেকে সব শোনার পর আমার সবকিছু কেমন এলমেলো হয়ে যাচ্ছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি এখন কি করব।

কিচ্ছু করতে হবে না তোমার। তুমি মন খারাপ করো না। তুমি মন খারাপ করলে আমি খুব কষ্ট পাব। আমাকে তুমি আর কষ্ট দিও না। তোমার জন্যে কষ্টে কষ্টে হৃদয় চুরমার হয়ে গেছে আমার। আজ সকালে তোমাকে সব বলার পর হৃদয় থেকে কি রকম একটি ভার নেমে গেছে। নিজেকে খুব সুস্থ মনে হচ্ছে। দেখ কতকাল পর আমি আজ সেজেছি। তোমার জন্য সুন্দর করে সেজেছি। আমার এই সুখের সময়ে তুমি কোন কষ্টের কথা বল না।

রুবার কথা শুনতে শুনতে বুকের ভেতর অদ্ভুত এক কষ্ট জেগে উঠল জাকির। এই মেয়েকে নিয়ে কি করবে জাকি। কেমন করে তাকে বোঝাবে, রুবা তোমার এই অদ্ভুত ভালবাসার কোন মূল্য আমি দিতে পারব না। সে সাধ্য আমার নেই। নিয়তি আমাদের দুজনকেই বহুদূর সরিয়ে নিয়েছে। এই দূরত্ব অতিক্রমের সাধ্য আমাদের নেই।

রুবা বলল, তুমি চুপ করে আছ কেন?

জাকি বলল, রুবা আমি, আমি

জাকির কথা শেষ হবার আগেই রুবা বলল, শোনো আমি ভেবেছি আজ সারা বিকেল তোমার সঙ্গে বাগানে ঘুরে বেড়াব। চল বাগানে যাই। বাগানে গিয়ে বল।

জাকি বিষণ্ন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। চল।

বিকেলের মনোরম আলোয় স্বপ্নের মত হয়ে আছে বাগানের গাছপালা। প্রথম প্রেমের মত সুবাসিত, তুলতুলে এক হাওয়া বইছে। পায়ের তলায় নরম মোলায়েম ঘাস। চারপাশে ফুল এবং পাতাবাহারের ঝোপঝাড়। মাথার ওপর ছড়ান ডালপালার এক বৃক্ষ। তারও অনেক, অনেক ওপরে খোলামেলা বিশাল এক আকাশ। সেই স্বচ্ছ নীল আকাশের গা ছুঁয়ে ভেসে যায় বনবেড়াল রঙের মেঘ। তার একটুখানি ছায়া এসে পড়ে পুরন প্রাচীন পৃথিবীতে।

বাগানে হাঁটতে হাঁটতে আকাশের দিকে তাকাল রুবা। উচ্ছল গলায় বলল, কি যে ভাল লাগছে আমার এখন। মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে জন্মের পর আমি কখন কোন বাগানে ঘুরে বেড়াইনি। কোন কোন বিকেলে এত সুন্দর হাওয়া বয়, আমি জানি না। ফুলের গন্ধ এত সুন্দর হয়, আমি জানি না। আকাশ এত সুন্দর, মেঘ এবং তার ছায়া এত সুন্দর, আমি জানি না। আজ জেনেছি। আজ তোমার জন্যে সব জেনেছি আমি। তুমি পাশে থাকলে আমার পৃথিবী হবে স্বপ্নের মত সুন্দর।

জাকি দুঃখি গলায় বলল, রুবা, কথাটা বলতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

কি কথা গো।

আমি কাল সকালে চলে যাব।

সঙ্গে সঙ্গে মুখখানি অদ্ভুত বিষণ্নতায় ভরে গেল রুবার। অপলক চোখে জাকির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। জাকিও খানিক তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল।

রুবা বলল, চল তো তুমি একদিন যাবেই। আমার নিয়তিতে নেই তোমাকে চিরকাল আমার বুকের কাছে ধরে রাখার। তবু, তবু কেন এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে তুমি। আর একটু থাক।

জাকি আগের মতই দুঃখি গলায় বলল, কি লাভ। তাতে দুঃখ কেবল বাড়বে। এই মুহূর্তে তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে তোমার কোন অসুখ নেই। তুমি ভাল হয়ে গেছ।

সত্যি আমি ভাল হয়ে গেছি। তোমার জন্যে ভাল হয়ে গেছি। তোমাকে সব বলতে পেরে ভাল হয়ে গেছি।

তারপর একটু থেমে রুবা বলল, তুমি কি আমাকে কিছুই বলবে না।

কি বলব?

সেই কথাটি, প্রিয়তম পুরুষের মুখে যা শোনার জন্যে এক জীবন ধরে অপেক্ষা করে নারী।

আবার রুবার মুখের দিকে তাকাল জাকি। তারপর ডানহাতটা রুবার গালে ছোঁয়াল। হৃদয়ের গভীর থেকে বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি।

দু'হাতে জাকির ডানহাত গালের সঙ্গে চেপে ধরল রুবা। আশ্চর্য ঘোর লাগা গলায় বলল, আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। পৃথিবীর কারু কাছে আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। আমার জীবনের সবচে বড় পাওয়া তোমার কাছ থেকে আমি পেয়ে গেছি। তোমার ভালবাসা, তোমার স্পর্শ অনেককাল ভাল রাখবে আমাকে। দিন যাবে, তোমার কথা ভেবে ভেবে হয়তো আবার কোন একদিন হৃদয় চুরমার হতে থাকবে আমার, আমার সেইসব দুঃখের মুহূর্তে, হৃদয়ের গভীর কষ্টের মুহূর্তে, তোমার ভালবাসার কথা, স্পর্শের স্বাদ বহুদূরের আকাশ থেকে একটুখানি মায়াবী ছায়ার মত এসে পড়বে আমার হৃদয়ে, শরীরে। আমি বেঁচে থাকব। আমি তোমার ভালবাসায় অনেককাল বেঁচে থাকব।

গলির ভেতর খানিকটা ঢুকে বুড়ো রিকশাঅলা বলল, আর যাওন যাইব না।

শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল খুকুর। এই জন্যে রিকশা চড়াটা সে একদম পছন্দ করে না। বুড়ো রিকশাঅলাগুলো এমনিতেই রিকশা চালায় হাছড়ে পাছড়ে। যেন নতুন সাঁতার শিখেছে, জলে নেমে পুরো শরীর ঠেলে ধাক্কে সাঁতরাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে রিকশায় প্যাডেল মারে তারা। দশ মিনিটের পথ যেতে লাগায় চল্লিশ মিনিট। অযথা ওভারটেক করে। অন্য রিকশার সঙ্গে স্পোক আটকে ফেলে। ব্রেক কষে রাখতে পারে না। অন্য রিকশার পেছনে গিয়ে ধাম করে ধাক্কা লাগায়। তারপর শুরু হয় গালাগাল। কী যে ভাষা একেকজনের। এ সব তো আছেই। তার ওপর হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেয় ফানি সব ব্যাপার। ফটাসসসসসস করে পাম্প চলে গেল, টায়ারে পেরেক ঢুকে গেছে। কখন তাদের ব্রেক যায় ছিঁড়ে। কত কি।

বুড়ো রিকশাঅলাগুলো এ ধরনের চালবাজী বেশি করে। মেয়ে প্যাসেঞ্জার থাকলে তো কথাই নেই। চালবাজীটা করবেই। যেখানে সেখানে নামিয়েও দেয়। দুএকজন আবার মাঝপথে গিয়ে রিকশা থামিয়ে নিজেদের দুঃখের কাহিনী শোনায়। আমি একদা এই ছিলাম সেই ছিলাম, ভাগ্যদোষে এখন রিকশাঅলা হয়েছি এইসব। শেষকথা বলবে, কিছু সাহায্য করে যান।

কখন ভেউ ভেউ করে কাঁদে কেউ। পেট ব্যথার ভান করে রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এইসব দেখলে সাহায্য না করে উপায় আছে কার। রিকশায় যদিও খুব কম চড়েছে খুকু, তবুও রিকশাঅলাদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতাটা তার হয়ে গেছে। বিশেষ করে বুড়ো রিকশাঅলাদের সম্পর্কে। জীবনে যে ক বারই রিকশায় চড়েছে সে, কি জানি কেন বুড়ো রিকশাঅলাই জুটেছে কপালে। আজও। ব্যাপারটা খুকুর দু একজন বন্ধু জানে। লাবণ্য একদিন বলেছিল, আমার মনে হয় খুকু তোর ভাগ্যে বরও জুটবে বুড়ো। তোর জীবনের রিকশাটাও চলবে টিমে তালে। লাবণ্যটা একটু আধটু কবিতা লেখে। ফিলসফি মেরে কথা বলে। শুনে খুকু খুব রেগে গিয়েছিল। মুন্নীরা খুব হাসাহাসি করেছিল।

এই মুহূর্তে লাবণ্যর কথাটা মনে পড়ে খুকুর। এমনিতেই রিকশাঅলা বলছে আর যেতে পারবে না, তার ওপর লাবণ্যর সেই কথা মনে পড়া, খুকুর মেজাজ যতটা খারাপ হওয়ার হয়ে গেল। কেন যে রিকশাটা সে নিয়েছিল।

রিকশায় খুকুকে খুব একটা চড়তে হয় না। বাড়িতে দুটো গাড়ি খুকুদের। একটা মেরুন রঙের টয়োটা স্টারলেট। সেটা পাপা ইউজ করেন। আর একটা ঘি রঙের ফোক্সভাগেন। মামনি আর খুকুর জন্যে। প্রায় বৃদ্ধ ড্রাইভার শওকত আলী ফোক্সভাগেন চালিয়ে খুকুকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে আসে। নিয়ে আসে। বন্ধুদের বাসায় গেলে কিংবা কোন আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে গেলেও গাড়ি নিয়ে যায় খুকু। কিন্তু আজ যেখানে যাচ্ছে সেখানে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না। শওকত

www.ahonni.com

আলী খুকুর সব বন্ধুকে চেনে, তাদের বাড়িঘর চেনে। মামনি জিজ্ঞেস করলে সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারে, অমুক আপার বাসায় গেছিলাম, তমুক আপার বাসায় গেছিলাম।

আজ যদি শওকত আলীকে নিয়ে আসত খুকু তাহলে ফিরে গিয়ে মাকে সে কী বলত। কার বাসায় গিয়েছিল বলত।

খুকু চায় না সে আজ যেখানে যাচ্ছে, যার কাছে যাচ্ছে, এই ঘটনার কোন সাক্ষী থাক।

সকালবেলা কলেজের গেটে নেমে খুকু তাই শওকত আলীকে বলেছিল, আজ আমাকে নিতে আসবার দরকার নেই। কলেজ থেকে বেরিয়ে আমি সোজা মুন্নীদের বাসায় চলে যাব। মুন্নীর আজ জন্মদিন।

শুনে শওকত আলী বলল, মুন্নী আপাগ বাসা তো আজিমপুর কলোনীতে। আপনে কয়টায় যাইব কন আমি আইসা লইয়া যামুনে।

এ কথায় খুকু একটু থতমত খেয়ে গেছে। মিথ্যে কথা সে একদম বলতে পারে না। উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। মুন্নীদের বাসায় যাব, মুন্নীর আজ জন্মদিন, একটু মিথ্যে বলতেই গলা কেমন আটকে আসছিল। আসলে মুন্নীর জন্মদিন তো আটই আগস্ট। আর চার মাস বাকি।

খুকুর মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মিথ্যে বলতে গিয়ে গলা আটকে গেলে খুকুর এমনিতেই মেজাজ একটু খারাপ হয়। তারপর সেই কথা যদি কেউ গায়ে না মাখে তাহলে আর কথা নেই। খুকু গলা উঁচু করে বলল, তোমার অত মাতাব্বরী দরকার নেই। আমার যখন খুশি রিকশা নিয়ে চলে যাব। তুমি কাট।

বেগম সাব যুদি আমারে কিছু কয়।

বইপড়া বাদ দিয়ে মামনির অত ঠেকা পড়েনি তোমার সঙ্গে কথা বলার।

যুদি কয়।

বললে বলবে, আমি তোমাকে আসতে মানা করেছি।

যেন এইমাত্র বুকের একটা হাড় ভেঙে গেছে শওকত আলীর, এমনি মুখ করে, ধীর গতিতে ফোক্সভাগেন চালিয়ে ফিরে গেল সে। তার মুখ ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলেছিল খুকু। রাগটা কেটে গিয়েছিল।

কলেজে ঢুকতে ঢুকতে খুকু তারপর শওকত আলীর কথা ভেবেছিল। গাড়ি চালাতে খুব পছন্দ করে লোকটা। মানুষের কত রকমের পছন্দ থাকে না। শওকত আলীর পছন্দ গাড়ি চালানো। ড্রাইভারগুলো সাধারণত গাড়ি চালাতে অপছন্দ করে। গাড়ি জিনিসটা তাদের এ্যালার্জির মত। যেন স্টিয়ারিংয়ে হাত দিলেই শর্দি লেগে যাবে। যেমন পাপার ড্রাইভার রহমত। গাড়ি সে চালাইতেই চায় না। ভারি বিরক্ত হয়। অথচ তাকেই চালাতে হয় সারাদিন। বিজনেসের ব্যাপারে সারাদিন ছুটোছুটি করে পাপা। মেরুন রঙের টয়োটা স্টারলেটের স্টিয়ারিং ধরে সারাদিন বসে থাকতে হয় রহমতকে। অথচ শওকত আলী চেয়েও তা পারছে না। মাইনে নেয় ছশ টাকা করে। কাজ করে না কিছুই। সকালবেলা ইস্কাটন থেকে গাড়ি চালিয়ে খুকুকে নিয়ে কলেজে আসে। তিনটের দিকে এসে বাড়ি নিয়ে যায়। আসা যাওয়া নিয়ে চারবার। ওটুকুই কাজ। বাকি সময়টা বাড়ির লনে গাড়িটা রেখে পেছনের সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে বসে থাকে। বসে বসে চাকর বাকরদের সঙ্গে আড্ডা। কখন মামনির দরকার হলে তাঁকে নিয়ে ঘন্টাখানেকের জন্য কোন মার্কেটে।

মামনি সাধারণত বাড়ি থেকে বেরোন না। বাইরে বেরোনো তার খুব অপছন্দ। মেয়েরা সাধারণত মা বাবা ভাইবোনদের বাসায় বেড়াতে যাওয়াটা খুব পছন্দ করে। মামনি এসবের ঘোর বিরুদ্ধে। ঘরে বসে কিংবা শুয়ে বই পড়া ছাড়া অন্যকিছুই সে পছন্দ করে না। তার খোঁজ খবর নিতেই আত্মীয় স্বজনরা সাধারণত খুকুদের বাসায় আসে। তাও মামনি যদি তখন পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাহলে কারও সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে না। চাকর বাকররা আত্মীয় স্বজনদের চা মিষ্টি খাওয়ায়। খুকু তাদের সঙ্গে গল্প গুজব করে। এতে কী তারা আর খুশি হয়। মন খারাপ করে চলে যায়।

মামনির উদাসীনতার কারণে আত্মীয় স্বজনদের আসা যাওয়া একদম বন্ধ হয়ে গেছে খুকুদের বাসায়। তাছাড়া পাপা নাকি প্রচণ্ড বড়োলোক হয়ে গেছেন বিজনেস করে। আজ লন্ডন যাচ্ছেন কাল সিঙ্গাপুর। ইদানিং লন্ডনের কোনও একটা কোম্পানীর সঙ্গে কোরাবরেশানে কি একটা কসমেটিকের ফ্যাক্টরী করছে টঙ্গিতে। তাই নিয়ে ব্যস্ত। এই সব দেখে শুনে আত্মীয়রা আরও কম আসে খুকুদের বাসায়। কেন যে। কারণটা খুকু ঠিক বুঝতে পারে না। অথচ পাপা মামনি দুজনেরই ব্যবহার অত্যন্ত চমৎকার। কথা বললে হেসে বলে। কিন্তু মামনিটা কথাই বলতে চায় না। শুধু বই পড়া, শুধু বই পড়া। আলাদা একটা রুমই বানিয়ে নিয়েছে পড়ার জন্যে। দোতলার পশ্চিম দিকের লম্বা রুমটা। চারদিকে ওয়াল টু ওয়াল কাল বার্নিসের বুক সেলফ। পায়ের তলায় গাঢ় সবুজ ঘাসের মত কার্পেট। একপাশে একটা ডিভান। আরেক পাশে একটা লম্বা সোফা। সোফার অদূরে একটা ইজি চেয়ার। এটাচড বাথরুম আছে। মাথার ওপর দুটো চায়নিজ ফ্যান। তবুও খুকুদের দোতলার চারটে রুমে গতবছর প্রচণ্ড গরম পড়লে পাপা এয়ারকুলার লাগিয়ে দিয়েছেন। টাকা হলেও অনেকের রুচিটা হয় না। মামনি পাপা দুজনেরই রুচিটা আছে।

এয়ারকুলার লাগানোর ফলে মামনির পড়ার আরও সুবিধে হয়েছে। আজকাল স্টাডিরুম থেকে আর বেরোয়ই না। শুধু তিনবেলা ডাইনিং টেবিলে খুকুর সঙ্গে তার দেখা হয়।

এইসব কারণে খুকুকে কলেজে আনা নেয়া ছাড়া ড্রাইভার শওকত আলীর আর কোনও কাজ থাকে না। তবে পড়ার বই শেষ হয়ে গেলে শওকত আলীকে নিয়ে বেরোয় মামনি। নিউমার্কেট, স্টেডিয়াম, বাংলাবাজার, সব বই পাড়া ঘুরে গাড়ি বোঝাই করে বই কিনে বাড়ি ফেরে। তারপর পড়তে বসে যায়।

যেদিন মামনি বই কিনতে বেরোয় সেদিন শওকত আলীর আহ্লাদের আর সীমা পরিসীমা থাকে না। গাড়ি চালাতে পারলে সে খুব খুশি। বুড়ো মানুষ। এখনও খানিকটা নীতিটিতি রয়ে গেছে। তার ধারণা কোনও কাজ না করেই সে ছশ টাকা মাইনে নিচ্ছে। জিনিশটা তার পছন্দ নয়। ফলে ফোক্সভাগেনটা সে দিনরাত চালাতে চায়। মাইনেটা হালাল করতে চায়।

কিন্তু খুকু কিংবা মামনি কেউ তাকে সেই সুযোগটা দেয় না। ওদিকে পাপার ড্রাইভার রহমত সাঁ সাঁ করে দিনরাত স্টারলেট চালিয়ে যাচ্ছে। চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। তার ক্লান্তি দেখে শওকত আলী একবার পাপাকে বলেছিল, খুকুকে কলেজে আনা নেওয়ার ফাঁকে ফোক্সভাগেন নিয়ে সে পাপার অফিসের সামনে গিয়ে থাকবে। পাপা যেন গাড়ি নিয়ে তাকে ইতি উতি কাজে পাঠান।

পাপা রাজি হননি। কেন যে।

খুকুদের কলেজ ছুটি হয়েছে তিনটের দিকে। কলেজ থেকে বেরিয়ে খানিকটা ভয় পেয়েছিল খুকু। শওকত আলী যদি এসে গাড়ি নিয়ে বসে থাকে। খুকুকে দেখে যদি বলে, চলেন আপনে যেখানে যাইব সেখানে আমি লইয়া যাই। যতক্ষণ লাগে আপনে মুন্নী আপাগ বাসায় থাকবেন। আমি গাড়িতে বইসা থাকুমনে। লোকটার তো বিশ্বেস নেই।

কথাটা ভেবে বুকের ভেতর খুব ঢিব ঢিব করছিল খুকুর। যদি এসে থাকে তাহলে তো কাটানোর কোনও উপায় থাকবে না।

কলেজের অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে ছিল খুকু। বেশ কয়েকবার। না শওকত আলী নেই। বুক ঢিব ঢিবানোটা কমে গেছে খুকুর। তখুনি পাশ থেকে স্বপ্না বলল, কিরে খুকু তোর গাড়ি আসে নি?

খুকু তাড়াতাড়ি বলল, না।

তারপর লাফিয়ে সামনে যে রিকশাটা পায় তাতে চড়ে বসে। গাড়ি আসেনি কেন, এই নিয়ে এখুনি সব বন্ধুরা সব কথা তুলবে। বিশেষ করে মণি। গাড়ি কেন আসে নি, কি ব্যাপার। আর কথা যদি একবার উঠে যায় তাহলে মিথ্যে বলতে বলতে টায়ার্ড হয়ে যাবে খুকু। গুলিয়ে ফেলবে। তাহলে আর রক্ষে নেই। খুকু কোথায় যাচ্ছে, কার কাছে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সব বের করে

www.shopnil.com

ফেলবে ওরা। কাজ নেই বাবা অত ঝামেলার। যত তাড়াতাড়ি পার কাট।
রিকশা চলতে শুরু করলে খুকু হঠাৎ করে রিকশাঅলাকে খেয়াল করে চমকে উঠে। যাহ্ বাবা আজও কপালে বুড়ো রিকশাঅলা। বুকটা আবার একটু কেঁপে ওঠে খুকুর।
রিকশাঅলা বলল, কোথায় যাইব আপা?
খুকু বিরক্ত হয়ে বলল, এলিফ্যান্ট রোড যাও।
এলিফ্যান্ড রোড কোনখানে?
গাউছিয়া মার্কেটের দিকে।
ভাড়া কইয়া লমু।
দরকার নেই।
না অনেকে তো আবার-
এত কথা বলো না তো। যাও।
রিকশাঅলা হে হে করে একটু হাসে। তারপর সাতরাতে থাকে।
গলিটা খুকুর চেনা। বাড়িটাও। জলির সঙ্গে একবার এসেছিল। ইফতেখারদের বাড়ি। ইফতেখারের সঙ্গে জলির প্রেম ছিল। এখনও আছে কি না কে জানে। জলি তো এখন চিটাগাংয়ে। জলির বাবা ট্রান্সফার হয়ে গেছেন। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় ইফতেখারের সঙ্গে প্রেম হয় জলির। একদিন কলেজ থেকে বেরিয়ে খুকুকে নিয়ে জলি এসেছিল ইফতেখারদের এই বাসায়। এইভাবে রিকশা নিয়ে। তারপর ঘন্টা দুয়েক গল্প মেরে পাঁচটার দিকে ফিরে গিয়েছিল। সেদিন খুকু কী জানত বছরখানেক বাদে আজ, সেই ইফতেখারদের বাসায় তাকে একাকী কখনও কখনও আসতে হবে।
খুকু বলল, যাওয়া যাবে না কেন?
রিকশাঅলা গলার ঘাম মুছতে মুছতে বলল, দেখেন না রাস্তা ভাঙ্গা। রিকশায় বসেই খুকু দেখে সামনের দিকে গলির অর্ধেকটার বেশি জায়গা ভাঙা। ইট পাটকেল পড়ে আছে। বোধহয় রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে।
খুকু রিকশা থেকে নেমে বলল, কত?
রিকশাঅলা অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, সাত টেকা দেন।
খুকু বুঝতে পারে লোকটা বেশি পয়সা চাচ্ছে। কিন্তু এদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। পকেটে হাত দিয়ে এক গাদা টাকা বের করে সে। তারপর নেড়ে চেড়ে দেখে পাঁচ টাকার এক টাকার নোট নেই। দশ টাকার আছে, পঞ্চাশ একশ টাকার আছে।
একটা দশ টাকার নোট বের করে খুকু। দেখে রিকশাঅলা বলল, ভাংতি নাই?
থাকলে তো দিতামই।
আমার কাছেও তো নাই।
তোমাদের কাছে কোনদিনও থাকবে না, বলে টাকার নোটটা ছুঁড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল খুকু। পেছন দিকে ফিরেও তাকায় না। মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে তার। ছোটখাট অনেক ব্যাপারে যখন তখন মেজাজ খারাপ হওয়া খুকুর স্বভাব। ছোটবেলা থেকেই। মা বাবার একমাত্র বলেই বোধহয় এরকম হয়েছে তার।
গলির ভেতর পশ্চিম দিকে আর একটা সরু গলি। কাঁচা মাটির। ভেজা স্যাতস্যাতে একটা ভাব গলিটায়। কাদা কাদা একটা গন্ধও আছে। সেই গলির শেষ মাথায় লোহার গেটঅলা ছোট্ট দোতলা বাড়ি ইফতেখারদের। বিকেলের মুখে মুখে কেমন নির্জন হয়ে যায় জায়গাটা। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে কী জানি কী কারণে খুকুর বুকটা একটু কেঁপে ওঠে। গেটের মুখে দাঁড়িয়ে কেমন একটু দ্বিধা হয়। ঢুকবে কি ঢুকবে না।
লোহার বড় গেটটার এক পার্টে আর একটা ছোট্ট গেট। সেটা হা করা। এক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উবু হয়ে সেই গেট দিয়ে ঢুকে গেল খুকু। তারপর চার পা হেঁটে থাক থাক তিনটে সিঁড়ি টপকে

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির পশ্চিম পাশের দরোজাটার সামনে এসে দাঁড়াল।
দরোজাটা বন্ধ কেন?
খুকু কি কলিং বেল বাজাবে। এমন তো কথা ছিল না।
দরোজাটায় সে হাত দেয়। সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে হা করে দুরোজা। তাই দেখে রিকশাঅলার ওপর রেগে থাকা ভাবটা কেটে যায় খুকুর। অজান্তেই পাতলা ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে এক টুকরো মিষ্টি হাসি। হ্যাঁ এরকমই তো কথা ছিল।
দরোজা ঠেলে খুকু তারপর ঘরে ঢুকে যায়। ঘরে ঢুকে দেখে দরোজার দিকে পেছন দিয়ে চাকাঅলা একটা রিভলবিং চেয়ারে বসে আছে একজন। খুকু যে ঘরে ঢুকেছে সে বোধহয় টের পায়নি। হাতে একটা পত্রিকা। খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। দেখে খুকুর আবার একটু রাগ হয়। ইস পড়াশুনোয় দেখি খুব মনোযোগ।
কিন্তু কথাটা মুখে বলে না। নিঃশব্দে চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে সামনের বন্ধ দরোজাটার দিকে তাকায়। বাথরুম। তার ভেতর ঝিরঝির করে জল পড়ছে, শব্দ পাওয়া যায়। গুনগুন করে গান গাইছে একজন, শব্দ পাওয়া যায়।
কে, বাথরুমে কে।
যে হোক, মরুক গে। খুকুর যাকে দরকার সে তো চেয়ারেই বসে আছে। পেছন থেকে তার পরিচিত সেই নীল শার্টের শাদা কলারটা দেখা যাচ্ছে।
চেয়ারের পেছন থেকে বেশ জোরে কু দিল খুকু। সঙ্গে সঙ্গে সিনেমার মত রিভলবিং চেয়ারটা ঘুরে গেল তার দিকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই খুকুর চোখ বড় হয়ে গেল। মাথার ওপর ফুল স্পিডে ঘুরছিল ফ্যান তবুও ঘেমে গেল খুকু। ঘরের এক কোণে সান্তানোর মিউজিক বাজছিল ক্যাসেটে। তখুনি অটো স্টপ হয়ে গেল। অজান্তেই খুকুর মুখ থেকে চমকে উঠার শব্দ বেরিয়ে এল, এ্যাঁ।
হাতের কাগজটা মেঝের কার্পেটে ছুঁড়ে ফেলে ছেলেটা হেসে উঠল।
চমকে গেলি, না?
খুকু তারপর দুটো ঢোক গিলে বলল, বাচ্চু তুই!
হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছিস নাকি?
খুকুর তখন বুক কাঁপছে, হাত পা কাঁপছে। এমনিতেই সে খুব দুর্বল স্বভাবের মেয়ে। অতিরিক্ত নার্ভাস হয়ে গেলে ফিট হয়ে যায়। এখন ঠিক ফিট হওয়ার আগের মুহূর্ত। এই ঘরে একা পেয়ে বাচ্চু যদি জোর করে। যদি বলে আমাকে তুই ভালবাসবি কথা দে। নয়ত তোর সর্বনাশ করব। কথা সে বাচ্চুকে সে কেমন করে দেবে। কথা তো সে আর একজনকে দিয়ে ফেলেছে। এই ঘরে তো এখন শুধু তারই থাকার কথা ছিল। এখানে বাচ্চু এল কেমন করে? ফিট হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে মাথাটা বার দুয়েক চক্কর খায় খুকুর। সেই চক্কর খাওয়ার ভাবটা হতেই বাচ্চু বলল, কিরে অত নার্ভাস হয়ে গেলি কেন? ভয় নেই। বোস।
খুব নার্ভাস হলে অজান্তেই বুকের ওপর ডান হাতটা চলে যায় খুকুর! হাতটা বুকেই ছিল। সেই দিকে তাকিয়ে বাচ্চু বলল, হাত নামা।
বিচ্ছিরি লাগে।
খুকু সঙ্গে সঙ্গে হাতটা নামায়। দেখে বাচ্চু বলল, গুড গার্ল। এবার বোস ও সোফাটায়।
খুকু আলতো পায়ে হেঁটে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো সোফাটায় ধপাস করে বসে ছিল। বাচ্চু তার চাকা লাগানো চেয়ারটা বসে বসেই চালিয়ে নিয়ে এল খুকুর সোফার সামনে।
খুকু ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে বাচ্চুকে দেখছিল। বাচ্চু পরে আছে নীল রঙের একটা টি শার্ট। দুটো পকেট, কলার আর হাতা দুটো শাদা। গলার সঙ্গে লেগে আছে মোটা একটা চেন। বাচ্চু দেখতে তাগড়া। মুখটা গোলগাল। চিবুক পর্যন্ত নামানো গোঁফ। চোখে গগলস। মাথা ভর্তি ঝাকড়া চুল। বাচ্চুর পরনের প্যান্টটা স্কিন টাইট। ফেড জিনসের। পায়ে অলিম্পিকের কেডস।

www.shopnil.com

মোজা নেই। বাচ্চুকে একদম সিনেমার ভিলেনদের মত দেখায়।
পকেট থেকে ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট বের করে ঠোঁটে সিগ্রেট গোঁজে বাচ্চু। তারপর অন্য পকেট থেকে লাল একটা লাইটার বের করে কায়দা করে সিগ্রেট ধরায়। ফোস করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে। দেখে খুকু হঠাৎ ভাবল উঠে একটা দৌড় দেবে কিনা। দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে পড়লে নিশ্চয় বাচ্চু আর কিছু করতে পারবে না।
কিন্তু বাচ্চু এখানে এল কেমন করে! এমন তো কথা ছিল না।
গলাটা অযথা মোটা করে বাচ্চু বলল, পালানোর চেষ্টা করবি না। তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।
বাচ্চুর আগের কথায় ভয়টা খানিক কেটে গিয়েছিল। কিন্তু এ কথায় আবার সেটা ফিরে আসে। ঢোক গিলে খুকু বলল, কি কথা?
তুই আমাকে দারোয়ান দিয়ে অপমান করিয়েছিলি কেন?
কথাটা খুকুর কানে যায় না। তার মনে পড়ে ইফতেখারের কথা। এটা তো ইফতেখারদের বাড়ি। জলির সঙ্গে সে এখানে এসেছিল। তখন জানত না ইফতেখার ওর বন্ধু। একসঙ্গে স্কুলে কলেজে পড়েছে। এবার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। সোসিওলজিতে। কাল ও যখন টেলিফোনে বলল, খুব জরুরী দরকার। তুমি এলিফ্যান্ট রোডের অমুক বাসায় আসবে। আমি অপেক্ষা করব। শুনে খুকু বলল, ওখানে তো আমার বন্ধুর লাভারের বাসা।
কি নাম?
ইফতেখার।
তোমার বন্ধুর নাম কি জলি? টিচাগাংয়ে থাকে?
হ্যাঁ, তুমি জলিকে চেন কেমন করে?
একথায় টেলিফোনেই একচোট হেসেছিল ও। ওই ইফতেখারই আমার বন্ধু। ওদের বাসায়ই তোমাকে আসতে বলছি। দোতালায় ওঠার সিঁড়ির সঙ্গেই দেখবে একটি দরোজা খোলা রুম। সেই রুমে বসে থাকব আমি। আসবে না?
খুকু আলতো করে বলেছিল, আসব।
কিন্তু ও কোথায়?
বাচ্চু বলল, কি বলছি?
খুকু চমকে ওঠে, কি?
তুই আমাকে দারোয়ান দিয়ে অপমান করিয়েছিলি কেন?
এ কথায় কেন যে নার্ভাস ভাবটা কেটে যায় খুকুর। হঠাৎ ম্যাচের কাঠির মত জ্বলে ওঠে সে। তুই আমার পেছনে লেগেছিলি কেন?
তোকে আমার খুব ভাল লাগে।
কাউকে ভাল লাগলেই বুঝি তার পেছনে ঘুর ঘুর করতে হবে। যখন তখন বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।
বাহ দাঁড়াব না। যাকে ভাল লাগে তাকে বারবার দেখব না? সে জন্যেই দারোয়ানকে বলেছিলাম। কিন্তু দারোয়ান তো তোকে বেশি কিছু বলেনি!
বলেনি মানে? মারতেই চেয়েছিল। আমি দৌড়ে পালিয়েছিলাম বলে রক্ষা।
খুকু বিরক্ত হয়ে বলল, ঠিকই করেছি। তোকে আমার ভাল লাগে না।
আমি তোকে ভালবাসি।
আমি তোকে ভালবাসি না। আমি অন্য একজনকে ভালবাসি।
সে কে?
তুই চিনবি না।
নামটা বল না।

নাম বললেই তুই চিনবি। ওরকম নামে কতজন থাকতে পারে।
তবুও বল না নামটা।
খোকা।
এ কথার সঙ্গে সঙ্গে হুররে বলে চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠে বাচ্চু। আর বাথরুমের দরোজা খুলে জিনসের প্যান্ট পরা, ভেজা চুল, শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে আসে খোকা আর ইফতেখার। দেখে খুকুর চোখে পলক পড়ে না। জন্মের পর কখন কোন ব্যাপারে এতটা অবাক হয়নি সে।
খোকা ততক্ষণে খুকুর একেবারে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই বিনীত ভূতের মত মাথাটা নুইয়ে দিয়েছে। ইয়েস, খোকা।
কিন্তু খুকু খোকার দিকে তাকায় না। বাচ্চুর সঙ্গে এতক্ষণ যে নাটকটি হল, তার ফলে খুকুর আবার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। বাচ্চুর মত একটা বখাটে ছেলের সঙ্গে খোকার সম্পর্ক কি! বাচ্চু এখানে এল কেমন করে।
এসব ভেবে খুকুর মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেছে।
বাচ্চুকে খুকু চেনে ছোটবেলা থেকে। আগে খুকুরা যখন মগবাজারে থাকত, ওদের পাশের বাড়িটাই ছিল বাচ্চুদের। একসঙ্গে খেলাধুলাও করেছে ওরা। ফলে তুই তোকারি সম্পর্ক।
কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চুটা জ্বালাতন শুরু করল। প্রথমে মুখে দুচারবার বলেছে, খুকু তোকে আমার খুব ভাল লাগে। আমি তোকে ভালবাসি। তুই আমাকে ভালবাসবি না?
খুকু সরাসরি মানা করেছে। বাচ্চুকে তার একদম ভাল লাগে না। পাড়ার সব বাজে ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বাচ্চুর। ওই বয়সেই সিগ্রেট খেত। মেয়েদের স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে ফিল্টিং মারত। বাচ্চুকে একদম পছন্দ করত না খুকু। সরাসরি মানা করার পর বাচ্চু একদিন চিঠি লিখে ফেলল খুকুকে। ইনিয়ে বিনিয়ে ভালবাসার কথা লিখল। হাতের লেখাটা কি বিচ্ছিরি? ভুল বানানে ভর্তি চিঠি। চিঠি পেয়ে খুকুর মেজাজ গেল আর খারাপ হয়ে। নিজে চিঠির খানিকটা পড়ে মামনিকে দিল। দ্যাখো মামনি, বাচ্চু কি সব করেছে।
তখন ইস্কাটনের বাড়িটা প্রায় রেডি হয়ে গেছে খুকুদের। রাতের বেলা পাপা সব শুনে ডিসিশান নিলেন আগামি মাসেই এপাড়া ছেড়ে যাব।
হলোও তাই।
কিন্তু ইস্কাটন যাওয়ার পরও খুকুর পিছু ছাড়ল না বাচ্চু। যখন তখন বাড়ির আশেপাশে ঘুর ঘুর করে। খুকুকে দেখলে ইশারা ইঙ্গিত করার চেষ্টা করে। খুকু প্রথমে ভেবেছিল সে পাত্তা না দিলে কদিন ঘুরে টুরে ফিরে যাবে বাচ্চু। কিন্তু যায় না। জ্বালাতন বেড়ে যাচ্ছে দেখে খুকু একদিন দারোয়ানকে বলল। শুনে দারোয়ান খুব তাড়া লাগিয়েছিল বাচ্চুকে। তারপর বাচ্চু আর খুকুদের বাড়ির পথ মারায় নি। এবং রাস্তাঘাটেও বাচ্চুকে আর দেখতে পেত না খুকু।
এসব বছরখানেক আগের কথা। তখন জলির সঙ্গে ইফতেখারের ভালবাসা চলছে।
খুকুকে দেখে বোবা হয়ে বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়েছিল ইফতেখার। এবার খুকু তার দিকে তাকাতেই বোকার মত হেঁটে এল। আরে তুমি?
তারপর খোকার দিকে তাকিয়ে বলল, ওকে তো আমি চিনি। তুই তো আমাকে বুঝিয়ে বলিস নি রে।
তোকে একটা সারপ্রাইজ দিলাম।
তুই জানতি নাকি ওকে আমি চিনি?
আগে জানতাম না। কালই জেনেছি।
কেমন করে?
টেলিফোনে ওর সঙ্গে কাল যখন কথা হচ্ছিল তখুনি জানা গেল। ফানি ব্যাপার। বলে ইফতেখার হাসতে থাকে। বাচ্চু তখন লম্বা জানালার পাশে যে সিঙ্গেল খাট, যার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে

www.shopnil.com

ক্যাসেট, লং প্লেয়িং রেকর্ড, দুএকটা ফিল্মি ম্যাগাজিন এবং একটা ওয়াকম্যান, সেখানে গিয়ে ওয়াকম্যানটা কানে লাগিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। দেখে খোকা বলল, কিবে আমাদের কথা আর শুনতে চাস না মনে হয়।

বাচ্চু শুনতে পায় না বলে কথা বলে না। ইফতেখার বলল, নাটক করে ও টায়ার্ড হয়ে গেছে।

খোকা বলল এসব তো তোরই প্লান।

তুই সাপোর্ট না দিলে তো আর হত না। আমার প্লান শুনেই তো লাফিয়ে উঠলি। নিজে গিয়ে দোতলা থেকে রিভলবিং চেয়ারটা টেনে আনলি। নিজের শার্ট খুলে দিলি বাচ্চুকে পরতে। তারপর বাচ্চুকে সাজিয়ে গুজিয়ে বসিয়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলি।

তুইতো বললি, চল গোসলটা সেরে নেই। এই ফাঁকে যদি এসে যায় তবে নাটকটা খুব জমবে।

বাচ্চুর মুখের গল্প শুনে আমার খুব মজা লেগেছিল। তাছাড়া আমাদের প্রমাণ করার দরকার ছিল যে খুকু তোকে ভালবাসে।

প্রমাণ হল?

হ্যাঁ, খুকু তো নিজের মুখেই বলল। খুকু তখন সোফায় বসে মাথা নিচু করে নখ খুটছে। তার পরনে স্কিন টাইট ফেড জিনসের প্যান্ট। পায়ের কাছে ফোল্ড করা। গায়ে লম্বা ঢোলা একটা ফুল স্লিভ শার্ট। আকাশীর ওপর শাদা ডোরা কাটা হাত গোটানো। গলায় ছেলেদের মত ছোট্ট পুঁতির মালা। কাল ব্যান্ডের পাতলা মতন একটা ঘড়ি আছে বাঁ হাতে। ঠোঁটে লিপস্টিক নেই। এমনিতেই খুকুর ঠোঁট খুব লাল। লিপস্টিক না লাগালেও মনে হয় লাগিয়েছে। মুখটা সব সময় একটু বিষণ্ন। চোখ দুটো একটু উদাস। খুকু কারও দিকে তাকালে মনে হয়, সে ঠিক তাকায়নি। একই দৃষ্টিতে একই সময়ে দৃশ্য অদৃশ্য অনেক কিছু দেখতে পায় খুকু। আর খুকুর চুলের তো কোন তুলনাই হয় না। কোমর পর্যন্ত নেমেছে। দেখে কিছুকাল আগে খোকা বলেছিল, আমার একটা অনুরোধ রাখবে তুমি?

খুকু চমকে উঠেছিল, কি?

চুলটা তুমি কখন কাটতে পারবে না।

ও এই কথা! আমি ভেবেছিলাম কি না কি বলবে। খুকু হেসেছিল। খুকুর হাসির কোন তুলনা এই পৃথিবীতে নেই। খুকু হাসলে একসঙ্গে জ্বলে ওঠে হাজারটা ফ্লাড লাইট। আলোকিত হয়ে যায় পৃথিবী। কিন্তু খুকুর গায়ের রঙ ফর্সা নয়। ফর্সা হলে বোধহয় খুকুকে এতটা সুন্দর লাগত না। তবে খুকুর, খুকুর ওই একটাই খুত, বড় রোগা।

ইফতেখার বলল, তো খুকু কেমন আছ? কী রকম একটা ব্যাপার হয়ে গেল, না! তুমি জলির সঙ্গে আমাদের বাসায় এসেছিলে, এই ঘরে বসে গল্প করেছিলে, অথচ তুমি যে আমাদের খোকার খুকু জানতেই পারি নি। খোকা খুব দেখাল।

খোকার ওপর রাগটা খুকুর তখনও কমে নি। বাচ্চুকে দিয়ে কি রকম নার্ভাসটা করাল। আড়চোখে খোকার দিকে একবার তাকিয়ে খুকু ইফতেখারকে বলল, জলি তো চিটাগাংয়ে।

হ্যাঁ। তোমাকে চিঠি ফিটি লেখে?

না, কোন যোগাযোগ নেই।

ইফতেখার গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমার সঙ্গেও কোন যোগাযোগ নেই।

তারপর খোকার দিকে তাকিয়ে বলল, সিগ্রেট দে খোকা।

খোকা ততক্ষণে বুঝে গেছে, খুকু রাগ করেছে। খুকু রাগ করলে তার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। কী করবে বুঝতে না পেরে সে উজবুকের মত দাঁড়িয়েছিল। ইফতেখার সিগ্রেট চাইতে সে একটু নড়েচড়ে উঠল। আমার কাছে তো সিগ্রেট নেই।

বাচ্চুর কাছে আছে। আন। বলে ইফতেখার রিভলবিং চেয়ারটায় বসে। সঙ্গে সঙ্গে খুকু ঢোলা বুকপকেট থেকে এক প্যাকেট ফাইভ ফিফটি ফাইভ বের করে দেয়। খুকুর পকেটে যে আস্ত এক প্যাকেট সিগ্রেট ছিল বোঝাই যায় নি।

সিগ্রেট দেখে চেঁচিয়ে উঠল ইফতেখার। আরে বা, চমৎকার মেয়ে তো। খোকা, তুই শালা লাকি! বলে প্যাকেটের সেলোফিন ছিঁড়ে। খুকু মাথা নিচু করে হাসে।

আস্ত সিগ্রেটের প্যাকেটটা বোধহয় বাচ্চুও দেখেছিল। দেখে ওয়াকম্যান ফেলে উঠে আসে। ইফতেখার সিগ্রেট বের করে বাচ্চু খোকা দুজনকেই দেয়। তারপর একটা বাড়িয়ে দেয় খুকুর দিকে, নাও খুকু।

যা আমি খাই না।

আজকাল তো অনেকেই খায়।

বাচ্চু বলল, খুকু অনেকের মত নয়। বলে খুকুর পাশে বসে পড়ে। দেখে খুকু ভুরু কোঁচকায়। তারপর নড়েচড়ে সরে বসে খোকা সিগ্রেটে ধরিয়ে খুকুর অন্যপাশে বসে পড়ে।

বাচ্চু বলল, খুকু প্লিজ তুই আমার ওপর রাগ করে থাকিস না। খোকা আমার খুব প্রিয় বন্ধু। আমি এক সময় তোকে ডিস্টার্ব করেছি, সেজন্য দুঃখিত। কিন্তু যখন জেনেছি খোকার সঙ্গে তোর, তারপর আর তোদের ওদিকে যাইনি। তুই আমাকে এখন থেকে বন্ধু ভাবিস। আমি তোদের হেলপ করব।

খুকু বলল নাটকটি করলি কেন?

বাহ আমি করেছি নাকি। তোর পেছনে আমি খুব লেগেছিলাম, দারোয়ান দিয়ে তুই আমাকে অপমান করিয়েছিস শুনে ইফতেখার আর খোকাই তো এসব করতে বলল।

খুকু মিষ্টি হেসে এই প্রথম খোকার দিকে তাকাল। দেখে ইফতেখার বলল, ওই বাচ্চু চল কাটি। ওদের একটু চান্স দিতে হয় না।

খুকু বলল, চান্সের দরকার নেই। আমি এখন চলে যাব।

শুনে বাচ্চু হা হা করে উঠল, তাহলে এত কিছু করে লাভ কী হল?

খোকা চুপচাপ সিগ্রেট টেনে যাচ্ছিল। ইফতেখার তার দিকে তাকতেই সে ফট করে ডান চোখটা মেরে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ইফতেখার বলল, ওই বাচ্চু তোর জন্যে কে যেন কফি হাউসে বসে থাকবে।

বাচ্চু বোকার মত ইফতেখারের দিকে তাকায়। ইফতেখার বাচ্চুকেও খোকার মত করে ডান চোখ মারে। দেখে বাচ্চু যা বোঝার বুঝে যায়। বলল, হ্যাঁ। চারটের সময় থাকবে বলেছিল। এখন তো সাড়ে চারটা।

ইস দেরি হয়ে গেছে। চল যাই।

দুজন উঠে দাঁড়াল। ইফতেখার খুকুর দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা ঘন্টাখানেকের মধ্যে আসছি। আমি অতক্ষণ থাকব না।

বাচ্চু বলল, তাহলে পরে দেখা হবে।

খুকু জীবনে এই প্রথম বাচ্চুর একটি কথার সুন্দর জবাব দেয়, আচ্ছা।

ওরা বেরিয়ে যেতেই খোকা সিগ্রেটটা এস্ট্রেতে চেপে দেয়। তারপর উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে আসে।

খুকু বলল, দরোজা বন্ধ করছ কেন?

কেউ যদি উঁকি দেয়?

দিলে দেবে।

না।

তারপর খুকুর পাশে এসে বসে খোকা।

ঘরের ভেতর এখন আবছা মতন একটা অন্ধকার। সবকিছু হঠাৎ কেমন চুপচাপ লাগে। পাশাপাশি বসে থাকে দুজন। কোন কথা বলে না। একা ঘরে খোকার পাশে বসে খুকুর ভেতর আবার কি কোন অভিমান খেলা করে।

খুকুর ডানহাতটা দুহাতে জড়িয়ে ধরে খোকা বলল, রাগ করেছ?

www.shopnil.com

খুকু কথা বলে না।
খোকা বলল, আমি অতটা বুঝতে পারি নি। মাফ করে দাও। আর কখন এমন করব না।
খোকার গলায় কি ছিল কে জানে, মুহূর্তে খুকুর সব অভিমান হাওয়া হয়ে যায়। তবুও খোকাকে বুঝতে না দিয়ে সে গম্ভীর গলায় বলে, বাচ্চু খুব বাজে ছেলে। ও তোমার বন্ধু হল কেমন করে?
আমরা স্কুলে এক সঙ্গে পড়েছি। কিন্তু কলেজে ঢুকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম। তখন বাচ্চুর সঙ্গে দেখা টেখা হত না। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে আট মাস হল ওর সঙ্গে আবার জমে গেছে।
ওকে তুমি আমার কথা জানিয়েছ কেন? ও খুব বাজে ছেলে। সিওর আমাদের বাসায় কোন না কোনভাবে জানিয়ে দেবে।
না জানাবে না। জানালে আর আগে জানাত। প্রায় বছর খানেক হয়ে এল বাচ্চু তোমার কথা জানে। জানার পর থেকেই তো তোমার পিছু নেয়া ছেড়ে দিয়েছে। অনেক দিন ধরেই আমাকে বলছিল তোমার সঙ্গে যেন ওর একদিন মুখোমুখি করিয়ে দিই! মাফটা চেয়ে নেবে।
ভাল হয়ে গেছে মনে হয়!
হ্যাঁ প্রেম করছে তো।
কার সঙ্গে?
সোমা নামের একটা মেয়ের সঙ্গে।
দেখতে কেমন?
খুব সুন্দর।
শুনে খুকু চুপ করে যায়। খোকার মুখে অন্য মেয়ে খুব সুন্দর কথাটা শুনে তার আবার একটু অভিমান হয়।
খোকা বলল, আজ তিনজন একত্রে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। ওই জায়গাটি সম্পর্কে বাচ্চু বেশ ভাল জানে। ম্যালা লোকজন ওর পরিচিত। ওকে না নিয়ে গেলে কাজ হত না। ফেরার সময় বলল, আজই যেন তোমার সঙ্গে ওর দেখাটা করিয়ে দিই।
কোথায় গিয়েছিলে?
পরে বলব।
এখুনি বলো না।
খোকা হেসে বলল, না পরে বলব।
তোমার এই রহস্য করাটা আমার একদম ভাল্লাগে না। ইফতেখারের সঙ্গেও রহস্য করে আমার ব্যাপারে কেমন একটা নাটক করলে।
এসবই তো মজা। ও ভাল কথা, তুমি সিগ্রেট খাও না কি?
যা।
তাহলে তোমার পকেটে সিগ্রেট এল কোত্থেকে?
তোমার জন্যে কিনে এনেছিলাম।
সত্যি। বলে খোকা চট করে খুকুর কপালে একটা চুমু খায়। তারপরই বলে, তুমি চুল কাটিয়েছ না কি!
খুকুর কপাল থেকে দুকান অব্দি চুলগুলো ছেলেদের মত ছোট করে কাঁটা। বাকি চুল কোমর পর্যন্ত। অথচ খোকা বলেছিল, খুকু তুমি কখন চুল কেট না।
খুকু বলল, সামনের চুল বড় থাকলে ব্যাকডেটেড মনে হয়।
তারপর একটু হেসে বলল, কেন আসতে বলেছ?
তুমি কলেজ থেকে আস নি?
তো কোত্থেকে আসব!
তাহলে তোমার বইখাতা কোথায়?
আজ বইখাতা ছাড়াই কলেজে এসেছিলাম। অত ঝামেলা নিয়ে কোথাও আসতে আমার ভাল্লাগে

না।
ব্যাগ?
কিসের ব্যাগ?
এই ধর টাকা পয়সা রুমাল লিপস্টিক রাখার জন্যে মেয়েরা আজকাল ছোট ছোট ব্যাগ ইউজ করে না!
তুমি এত কিছু জান কি করে! ব্যাগ ফ্যাগ আমার ভাল্লাগে না।
কেন আসতে বলেছ?
এমনিতেই। কতদিন তোমাকে দেখি না।
কথাটা ভারি মায়াবী স্বরে বলল খোকা। শুনে খুকু চোখ তুলে খোকার দিকে তাকায়। তাকিয়ে থাকে। অপলক। খোকাকে আজ দারুণ লাগছে। জিনসের প্যান্টের ওপর গাঢ় খয়েরী রঙের হাফ হাতা টি শার্ট পরা। চেস্টা কলার আর পকেটের ওপর দিককার বর্ডারটা বিসকিট কালারের। খুব সুন্দর শার্ট। খোকাকে খুব মানিয়েছে। অজান্তেই খুকুর ডানহাতটা চলে যায় খোকার গালে। আস্তে আস্তে খোকার গালে হাত বুলিয়ে দেয় সে। আমাকে বুঝি খুব দেখতে ইচ্ছে করে!
খোকা ডানহাতে তার গালে বোলানো খুকুর হাতটা গালের সঙ্গে চেপে ধরে বলে, খুব। কতটা যে, তোমাকে বোঝাতে পারব না।
সত্যি?
সত্যি!
কিন্তু!
কি?
জান আমার না আজকাল ভীষণ ভয় করে।
কিসের ভয়?
মামনি পাপা ওঁরা জেনে ফেললে কি যে হবে!
কি হবে? কখন না কখন তাঁরা জানবেনই।
আমি তো একমাত্র মেয়ে। পাপা এত বড়লোক। আমাকে নিয়ে তাদের খুব আশা। ইন্টারমিডিয়েট আমি ভাল রেজাল্ট করলে আমাকে কেমব্রিজে পড়তে পাঠাবেন। অথচ আমি জানি আমার রেজাল্ট ভাল হবে না। পরীক্ষার আর দুমাস বাকি। কিন্তু আমার একদম পড়া শুনো হচ্ছে না। সব সময় তোমার কথা মনে পড়ে। পড়তে বসলে আরও বেশি। ম্যাট্রিকে স্টার মার্ক পেয়েছিলাম। এবার ফার্স্ট ডিভিসানই পাব না।
খোকা চুপচাপ খুকুর দিকে তাকিয়েছিল। কথা বলতে বলতে খুকুর মুখটা কেমন বিষণ্ন হয়ে গেছে। দেখে কী যে মায়া হয় তার! দুহাতে খুকুর মাথাটা টেনে আনে। তারপর বুকে চেপে ধরে। ধরে রাখে। ঘুমোবার আগে শিশুরা যেমন প্রিয়জনের বুকে আশ্রয় নেয় সেরকম আদুরে ভঙ্গিতে খোকার বুকে মাথাটা চেপে রাখে খুকু। বলে, প্রথম প্রথম কে জানত কাউকে ভালবাসলে সবকিছু এমন উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। তোমাকে ভাল লেগেছিল, তোমার দিকে ঝুকেছিলাম। অত কিছু বুঝিনি। যত দিন যাচ্ছে তোমার জন্যে মায়াটা তত বেড়ে যাচ্ছে। তোমাকে সব সময় দেখতে ইচ্ছে করে। দেখা না হলে খেতে ইচ্ছে করে না, ঘুমোতে ইচ্ছে করে না। শুধু কান্না পায়। ভালবাসার এত কষ্ট জানলে আমি কখন তোমাকে ভাল বাসতাম না।
খুকুর মাথায় পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে খোকা বলল, আমারও ঠিক তোমার মতই হয়। ভালবাসলে আসলেই খুব কষ্ট পেতে হয়। দুজন দুজনার জন্যে কষ্ট না পেলে সেটা আবার কেমন ভালবাসা! তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে খোকা বলল, এই তুমি দুপুরে কি খেয়েছ?
কি খাব! আমি তো বাসায়ই যাইনি।
যাহ এতক্ষণ না খেয়ে আছ! বলে খুকুকে আলতো করে সরিয়ে দেয় খোকা! তারপর উঠে

www.shopnil.com

www.shopnil.com

দাঁড়ায়। আমি তোমার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসি।
শুনে খোকার হাত টেনে ধরে খুকু। না আমি কিছুই খাব না। তুমি জান না আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। বাড়ির ঝি চাকররা খাবার নিয়ে সব সময় আমার পেছনে লেগে থাকে। শিশুর মত ধরে ধরে না খাওয়ালে আমি কখন খাই না। শুধু আমাকে খাওয়ানোর জন্যে মামনি তাঁর বই পড়া বাদ দিয়ে আমার পেছনে লাগেন। আমি কলেজ থেকে ফিরি তিনটায়, সেজন্যে আমাদের দুপুরের খাওয়া হয় তিনটের পরে। পাপাও ঘন্টাখানেকের জন্যে বাড়ি ফেরেন তিনটের দিকে। তারপর আমরা তিনজন টেবিলে যাই। আজ আমি বাড়ি ফিরিনি। দুপুরের খাবার মামনি কিংবা পাপা খাবেন না।
কিন্তু এতক্ষণ না খেয়ে থাকলে তোমার শরীর খারাপ করবে।
কিছু হবে না। আমার অভ্যেস আছে। তাছাড়া
কি?
কেউ সেধে না খাওয়ালে আমি খেতে পারি না।
আমি তোমাকে খাইয়ে দেব।
বাইরের খাবার খেলে আমার বমি হয়।
তাহলে ওপরে ইফতেখারের আম্মাকে বলি কিছু খাবার দিতে। ওরা অবশ্য জানে না তুমি এসেছ।
জানানোর দরকার নেই। আমি এক্ষুনি চলে যাব।
এ কথা শুনে খোকা আবার খুকুর পাশে বসে। কেউ সেধে না খাওয়ালে তুমি যখন খেতে পার না, তাহলে বিয়ের পর কি করবে?
কেন বর আমাকে সেধে খাওয়াবে।
বরের কি আর কোন কাজকাম থাকবে না। খাবার নিয়ে সে সারাদিন তোমার পেছনে লেগে থাকবে কেমন করে।
থাকতে হবে।
তোমার মামনি আর পাপা যখন তোমাকে ছাড়া একবেলাও খেতে পার না, তোমার বিয়ে হয়ে গেলে তাঁরা কি করবে। কিংবা তুমি যদি কেমব্রিজে পড়তে চলে যাও। ইস তুমি অতদূরে চলে গেলে আমি পাগল হয়ে যাব।
খুকু তখন আনমনা হয়ে গেছে। অপলক চোখে তাকিয়ে আছে খোকার মুখের দিকে। কিন্তু বোঝা যায় খোকাকে সে দেখছে না। দেখছে অন্যকিছু। ভাবছে অন্য কথা।
খোকা বলল, কি হল?
বুক কাঁপিয়ে ভারি একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে খুকুর। তারপর সামলে নিয়ে বলে, তুমি দুপুরে খেয়েছ?
হ্যাঁ। আমরা তিনজন এক সঙ্গে খেয়ে নিয়েছি।
কোথায়?
হোটেলে।
কি খেয়েছ?
কেন ভাত।
এ মা তুমি হোটেলে ভাত খেলে।
হোটেলে ভাত খেলে কি হয়।
আমি পছন্দ করি না।
তাহলে আর কখন খাব না।
খুকু তারপর আবার উদাস হয়ে যায়, বিষণ্ন হয়ে যায়।
খোকা বলল, কি ভাবছ?
আমরা যেভাবে জড়িয়ে যাচ্ছি, এত কিছুর পর যদি আমাদের বিয়ে না হয়।

কেন হবে না?
তোমাদের ফ্যামিলি আমাদের ফ্যামিলি
ফ্যামিলিতে কি হয়েছে?
এখনও কিছু হয়নি। কি হবে, কেউ তো জানেই না কিছু। আমাদের ফ্যামিলিতে জানাজানি হয়ে গেলে ভীষণ প্রবলেম হবে।
কি প্রবেলম?
তোমার কাছে বিয়ে দিতে পাপা কিছুতেই রাজি হবেন না।
কেন? আমি কি খুব খারাপ ছেলে?
না, তা নয়। তুমি খারাপ ছেলে হলে তোমাকে কি আমি কখন ভালবাসতাম।
তাহলে?
তোমাদের ফ্যামিলিটা বড়। তোমার বাবা রিটায়ার্ড। ভাইদের ওপর সংসার। এতগুলো বোন বিয়ে দিতে হবে তোমাদের। তাছাড়া তোমরা বড়লোক নও।
সব শুনে খোকা বলল, এসব কি তুমিও ভাব?
আমি কেন ভাববে। পাপা এত বড়লোক। আমি তাঁর একমাত্র মেয়ে। দেখেশুনে একমাত্র মেয়েকে কেউ
খোকা গম্ভীর গলায় বলল, এসব আমিও খুব ভেবেছি। ভেবেই ডিসিশানটা নিয়েছি।
কি ডিসিশান?
তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ?
খুকু হেসে বলল, কি বলছ? তোমাকে ছাড়া অন্য কিছু আমি ভাবতেই পারি না। নয়ত তুমি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে একা একা এতদূর তোমার কাছে চলে আসব কেন?
খোকা গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়াল। তারপর খাটের কাছে গিয়ে বিছানার তলা থেকে লম্বা ভাঁজ করা একটা কাগজ এবং বলপয়েন্ট নিয়ে এল। এসে কাগজটা খুকুর সামনে মেলে দিয়ে বলল, সই কর।
কি এটা।
কোর্টের কাগজ। তুই সই করে দিলেই আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে।
কি বলছ?
হ্যাঁ আমি অনেক ভেবে দেখেছি এ ছাড়া কোন উপায় নেই। বাচ্চু এবং ইফতেখারকে বলায় ওরাও বলল বিয়ে করে ফেলতে। বাচ্চুটা সব জানে। আমরা তিনজনই আজ কোর্টে গিয়েছিলাম। বাচ্চুর পরিচিত উকিল ছিল। তাকে বাচ্চু সব খুলে বলতেই তিনশ টাকা নিয়ে এইসব কাগজপত্র রেডি করে দিল। আমি সই করেছি। এখন তুমি সই করলে কাল সকালে গিয়ে উকিলের হাতে দুশো টাকা আর কাগজটা দিয়ে আসব। তাহলেই হয়ে গেল। তুমি দুশ টাকা দিয়ে যাবে। আমার কাছে আর টাকা নেই। তিনশ টাকার জন্যেই ম্যালা ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল। কোথাও পাইনি। পরে বাচ্চু দিল।
সামনে খুকুর দেয়া সিগ্রেটের প্যাকেটটা ছিল। তিনটে মাত্র খাওয়া হয়েছে। খোকা সেই প্যাকেট থেকে একটা সিগ্রেট নিয়ে ধরায়।
কাগজটা দেখার পর থেকে খুকু কেমন থম ধরে গিয়েছিল। খোকা তার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, আমি অনেক ভেবে-চিন্তে এটা করেছি। এখন আমাদের বিয়ে হয়ে থাকবে কিন্তু কথাটা আমরা কাউকে জানাব না। তুমি আমি দু'জনেই পড়াশুনো করব। পাশ করে আমি যখন চাকরি বাকরি নেব তখন তোমাদের বাসায় প্রোপোজাল পাঠাব। তোমার মা বাবা যদি রাজি না হন তাহলে বিয়ে আমাদের হয়ে গেছে জানিয়ে দেব। তোমার মা বাবা তুলে দিলে দেবে নয়ত তুমি এমনিতেই চলে আসবে। আর তোমাকে যদি বিদেশে পড়তে পাঠাতে চায় তুমি কিছুতেই যাবে না। দাও, সই করে দাও। আর দুশ টাকা দিয়ে যেও।

খুকু গম্ভীর গলায় বলল, টাকার তোমার দরকার হলে দিতে পারি কিন্তু সই আমি করব না। কাগজটা ছিঁড়ে ফেল।
যেন হঠাৎ খুব জোরে কেউ চর মেরেছে খোকার গালে এমন ভাবে চমকে উঠল খোকা। খুকু পাত্তা না দিয়ে বলল, এতো তাড়াতাড়ি এসবের দরকার নেই। যদি কখন অমন পরিস্থিতি হয় তখন দেখা যাবে। তাছাড়া আমার তো আর এক্ষুনি বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না।
শুনে খোকা খুব রেগে যায়। না, তুমি সই কর। নয়ত আমি বান্ধুদের কাছে খুব ইনসাল্ট হব। বান্ধু আমাকে আগেই বলেছিল যে এভাবে বিয়েতে তুমি রাজি হবে না। আমি তাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছি। খুকু আমাকে ভালবাসে। আমি যা বলব তাই করবে সে।
খোকার হাত ধরে খুকু বলল, আমি তোমাকে সত্যি খুব ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না। তুমি রাগ করো না। প্লিজ। তাহলে আমি মরে যাব।
ভালবাসলে এক্ষুনি বিয়ে করতে তোমার অসুবিধা কি?
আমি এভাবে চাই না।
আমরা চারজন ছাড়া কেউ এ কথা জানবে না।
তবুও।
তুমি সই করবে না?
অমন করে বলো না, প্লিজ।
খুকুর চোখ ছলছল করে। খোকা সে সব গ্রাহ্য না করে লাফিয়ে ওঠে। তুমি আসলে আমাকে ভালই বাস না। এসব এ্যাকটিং। আমি সব বুঝি। বড়লোকের মেয়েরা এমনই হয়। বান্ধু ঠিকই বলেছিল। লাগবে না। আমার কিছু লাগবে না। কত মেয়ে আমার জন্যে লাইন দিয়ে আছে। বলে খুকুর হাতের কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে ফর ফর করে ছেঁড়ে খোকা। ছিঁড়ে কুটি কুটি করে কার্পেটের ওপর ছুঁড়ে ফেলছে তখন ইফতেখারের বুক সেলফের ওপর রাখা ক্যাসেট রেকর্ডারটা ঘাট করে স্টপ হয়ে যায়। জিনিশটা এতক্ষণ চলছিল খোকা খুকু কেউ তা জানে না। কে চালিয়েছিল?
খোকা বলল, ও কে খোদা হাফেজ। তোমার সঙ্গে আমার আর কখন দেখা হবে না। বলে দরোজা খুলে গটগট করে বেরিয়ে যায়। খুকু বিধ্বস্ত ভঙ্গিতে সেদিকে খানিক তাকিয়ে থাকে। তারপর হাঁটুতে মুখ গুজে হু হু করে কাঁদে। জন্মের পর এতটা দুঃখ সে কখন পায়নি। এমন করে কখন কাঁদেনি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে খোকা মনে মনে বলল, আমি আর একটা প্রেম করব। খুকু তুমি দেখে নিও সেই মেয়েটিকে আমি যা বলব সে তাই করবে।
এটা চারদিন পরের ঘটনা। এই চারদিন খোকা একদম বাড়ি থেকে বেরোয়নি। ইউনিভার্সিটিতে যায়নি। ইফতেখার বান্ধুদের সঙ্গে দেখা করেনি। এক বছরের ইউনিভার্সিটি জীবনে এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম। গত এক বছরে খোকা এক নাগারে চারদিন কখন ক্লাশ কামাই করেনি। চারদিন তো দূরের কথা দুদিনও ইফতেখার বান্ধুর সঙ্গে দেখা করে থাকেনি।
সেদিন খুকুকে ইফতেখারের ঘরে ফেলে সোজা বাড়ি চলে এসেছে খোকা। তারপর চারদিন নিজের ঘর থেকে বেরোয়নি। দিনরাত শুয়ে থেকেছে। গম্ভীর হয়ে থেকেছে। মা প্রতিদিন এসে দুতিনবার জিজ্ঞেস করে গেছেন, খোকা তোর কি শরীর খারাপ?
মেজো আপার সঙ্গে খোকার আলাদা একটা বন্ধুত্ব আছে। খুকুর কথা এই সংসারে সে খানিকটা জানে। ভাল করে কেবল জানে ছোট ভাবী। তারা দুজনে চারদিনে অন্তত আটবার জিজ্ঞেস করেছে, কিরে খুকুর সঙ্গে ঝগড়া করছিস নাকি?

খোকা কোন জবাব দেয়নি। মাকে বলেছে, না আমি ভালই আছি। মেজো আপা আর ছোট ভাবীকে বলছে, খুকুর সঙ্গে আমার কিছুই হয়নি। কিন্তু খুকু যদি টেলিফোন করে তাহলে সোজা বলে দেবে আমি ওর সঙ্গে কথা বলব না।
মেজো আপা বলেছে, তাহলে নিশ্চয় ঝগড়া হয়েছে।
না। আমি শুনেছি খুকু মেয়েটা ভাল না। আমি ওর সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখতে চাই না।
ছোট ভাবীকে বলেছে, খুকুর সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। টেলিফোনে সোজা বলে দেবে কথাটা।
ভাবী কথা বিশেষ বলেনি। মুচকি হেসে চলে গেছে।
খোকা শুনেছে খুকু নাকি প্রতিদিনই দু'তিনবার টেলিফোন করে। মেজো আপা কিংবা ছোট ভাবী কি বলেছে কে জানে। একদিন টেলিফোন ধরেছিল মা। ভাগ্যিস খোকা তখন ঘুমুচ্ছিল। ফলে খুকুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে হয়নি খোকাকে।
খোকাদের সংসারটা এই রকম, খোকারা চার ভাই তিন বোন। প্রথমে তিন ভাই। তিনজনই পড়াশুনো শেষ করে চাকরি এবং বিয়ে করে নিয়েছে। তারপর পরপর তিনটে বোন। একজনেরও বিয়ে হয়নি। বড়টি একটি কলেজে পড়ায়। বাকি দুটো একটি অর্থাৎ খোকার মেজো আপা এবার এম.এ দেবে। বাংলায়। তার পরেরটি ডাক্তারী পড়ে। থার্ড ইয়ার। তারপর সবার ছোট খোকা। মা বাবাও আছেন। বাবা রিটায়ার করেছেন ম্যালা দিন। সারাজীবন চাকরি করে ছেলেমেয়ে মানুষ করা এবং লেকসার্কাসে আট কাঠার ওপর এই দোতলা বাড়ি ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। এখন মনের আনন্দে ইজি চেয়ার নিয়ে সারাদিন বারান্দায় বসে থাকেন। বসে খবরের কাগজ পড়েন। সংসারে তাকে একটা বাড়তি মানুষ মনে হয়। মা ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে খুব একটা পাত্তা দেয় না। এমনকি ছোট ছেলে খোকাও। সেই বাবাও খোকাকে চারদিন বাড়ি থেকে বেরুতে না দেখে অবাক হয়েছিল। একদিন খোকার ঘরে ঢুকে কপালে হাত রেখে বলেছিল, কিরে, শরীর খারাপ?
কথাটা শুনে সেই প্রথম বাবার জন্য কেমন একটা মমতাবোধ করেছিল খোকা। সাধারণত বাবার সঙ্গে সে রাগী গলায় কথা বলে। সেদিন প্রথম নরম স্বরে বলেছিল, না এমনিতেই শুয়ে আছি। ভাল্লাগছে না।
চারদিন পর, দুপুরের পরপর খোকা আজ বেরিয়েছে। খুব সাজগোজ করে। হাতাকাটা শাদা একটা গেঞ্জি পড়েছে। গেঞ্জিটার বুকে পিঠে কি কি সব লেখা। দুকাঁধের ওপর দিয়ে, গেঞ্জির বুক ঢেকে দিয়ে চলে গেছে জিনসের নিকার বুকারের বেল্ট। দু'কন্ধার কাছে দুটো বকলস। নিকার বুকার পরাটা চালু হয়ে গেছে ঢাকায়। ছেলেমেয়েরা সমানে পরছে আজকাল। জিনিশটা খোকা বানিয়েছিল মাস দুয়েক আগে। এক আধদিন পড়েছে। খুব একটা ভাল লাগেনি তার। তাছাড়া নিকার বুকার পরে খুকুর সঙ্গে একদিন দেখা করেছিল। খুকু পছন্দ করেনি। এখন খুকুর সাথে আর কোন সম্পর্ক নেই। খুকুর পছন্দ অপছন্দে তার কি যায় আসে।
খোকার পায়ে ছিল অলিম্পিকের কেডস। নিজেকে বেশ সুন্দর লাগছিল খোকার। বাড়ি থেকে বেরিয়ে, রাস্তার মোড়ে যে সেলুনটা আছে খোকা রিকশার জন্যে সেই জায়গাটায় দাঁড়ায়। সারা দুপুর আজ সে যা ভেবেছে, যার কথা ভেবেছে, খোকা এখন সেখানে যাচ্ছে। কথাটা ভেবে খোকা আবার মনে মনে বলল, তুমি দেখে নিও খুকু। আমি ঠিক আরেকজনকে
কিন্তু ধারে কাছে কোন রিকশা নেই। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে। আর রিকশার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকাটা খুবই বাজে ব্যাপার। খোকা আস্তে ধীরে রেগে যেতে থাকে। মনে মনে রিকশাঅলাদের খুব একচোট গালাগালি করে সেলুনের পাশেই যে পান সিগ্রেটের দোকান তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। একটা সিগ্রেট ধরালে ভাল লাগবে এখন। সিগ্রেটও খাওয়া হবে রিকশার জন্যে অপেক্ষাও করা হবে।
সিগ্রেট নিয়ে দোকানের সঙ্গে ঝুলে থাকা দড়ির আগুনে ধরাতে গিয়ে খোকার চোখ পড়ে পাশের

www.shopnil.com

সেলুনে ঠিক তার মুখোমুখি হয়ে থাকা একটা আয়নার দিকে। সিগ্রেট টানতে টানতে আয়নায় সে নিজেকে দেখে। বাহ চমৎকার লাগছে তো আজ। নিকার বুকারের সঙ্গে শাদা গেঞ্জিটা বেশ মানিয়েছে। খোকা অবশ্য দেখতেও বেশ ভাল। গায়ের রং শ্যামলা। মাথার চুল অমিতাভ বচ্চনের মত। স্বাস্থ্যটা ভাল। মুখটা একট্রাকটিভ। কিন্তু পাতলা দাঁড়িগোঁফ কেমন একটু নোংরা হয়ে আছে। গাল এখনও ক্ষুর কিংবা ব্লেডের স্পর্শ পায়নি। খোকার বন্ধুরা সবাই সেভ করে। বাচ্চু তো কায়দা করে মোচও রেখেছে। ইফতেখার ক্লিন। রোজ সেভ করে। খোকাকে বহুদিন ওরা বলেছে, সেভ করে ফ্যাল খোকা। আর কতকাল খোকা হয়ে থাকবি।

খোকা করেনি। একবার সেভ করে ফেললেই তো গেল। রোজ না হোক দু'একদিন পরপর তো কাজটা করতে হবে। ঝামেলা না।

কিন্তু সেলুনের আয়নায় আজ নিজেকে দেখে খোকার মনে হয়, সেভ না করলে এত সুন্দর পোশাক পরার পরও তাকে ঠিক সুন্দর লাগছে না। যে কাজে যাচ্ছে, সুন্দর না লাগলে সেখানে যদি পাত্তা না পায়।

খোকা সোজা সেলুনে ঢুকে গেল।

মিনিট দশেক পর সেলুন থেকে খোকা যখন বেরুল তখন সে পুরুষ হয়ে গেছে। দাঁড়িগোঁফ সবই ফেলে দিয়েছে। ফলে মুখটা অসম্ভব ফর্সা দেখায়। নিজেকে ভারি সুন্দর লাগে খোকার।

গালে হাত বুলাতে বুলাতে খুকুর উদ্দেশে মনে মনে খোকা আবার বলল, তুমি দেখে নিও খুকু। আমি ঠিক

ঠিক তখুনি একটা রিকশা এসে দাঁড়াল খোকার সামনে। খালি ভেবে ডাকতে যাবে খোকা, দেখে রিকশায় ইফতেখার বসে আছে। খোকাকে দেখে রিকশায় বসেই বলল, কোথায় যাচ্ছিস। আরে আমি তো তোর ওখানে যাচ্ছিলাম। চারদিন দেখা নেই।

খোকা গম্ভীর গলায় বলল, বাড়ি থেকে বেরুইনি।

একন যাচ্ছিস কোথায়? বলেই হা করে গেল ইফতেখার। তারপর উত্তেজনায় রিকশার ওপর দাঁড়িয়ে গেল, আরে বাহ। সেভ করে ফেলেছ গুরু? বাহবা, আরে তুই তো অমিতাভ বচ্চন বান গায়া রে। ওঠ ওঠ, রিকশায় ওঠ।

মুচকি হেসে রিকশায় ইফতেখারের পাশে উঠে বসে খোকা। সঙ্গে সঙ্গে ইফতেখার সিগ্রেট বাড়িয়ে দেয়। নাও টান গুরু।

খোকা সিগ্রেট ধরিয়ে গম্ভীর হয়ে টানতে থাকে।

ইফতেখার বলল, মন খারাপ নাকি?

না তো।

বুঝি বুঝি। বাদ দাও ওসব। এমন কত আসবে যাবে। জলিও তো আমার সঙ্গে রঙ্গ করে চলে গেছে। তো কি। আমি আর প্রেম করতে পারিনি। কান্তা কি জলির চে খারাপ।

শুনে চমকে ওঠে খোকা। ইফতেখার এসব বলছে কেমন করে। খুকুর সঙ্গে তার কথাটথা আড়ালে থেকে সব শুনেছে নাকি। না খুকুকে ফেলে চলে আসার পর ইফতেখার ফিরেছিল।

খুকুই কি সব বলেছে তাকে?

খোকা বলল, কি বলেছে খুকু?

খুকু কি বলল। ওর সঙ্গে তো আমার দেখাই হয়নি। আমি ফিরেছি রাত আটটার দিকে।

তাহলে?

কি তাহলে!

তুই এসব বলছিস কেমন করে।

ইফতেখার হেসে তার বুক পকেট দেখায়। এটা থেকে জেনেছি।

খোকা দেখে ইফতেখারের বুক পকেটে একটা ক্যাসেট। ক্যাসেটটা দেখেও সে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। বোকার মত তাকিয়ে থাকে।

ইফতেখার বলল, তুমি তো মুডে ছিলে গুরু কিচ্ছু বুঝতে পারনি। ক্যাসেট অন করে গিয়েছিলাম আমি। তোমাদের যাবতীয় আলোচনা আছে এটায়। চারদিন ওয়েট করলাম। তুমি গেলে জিনিশটা তোমাকে প্রেজেন্ট করতাম। তুমি শালা গেলে না। বাধ্য হয়ে আজ নিয়ে এসেছি।

রিকশা তখন ধানমন্ডি ছ নম্বর রোড ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল খোকা। দে ক্যাসেট দে। আমি এখন নেমে যাব।

কোথায় যাবি?

যাব এক জায়গায়। পরে বলব। দে ক্যাসেটটা দে।

ক্যাসেটটা নিয়ে খোকা ছ নম্বরের মুখে নেমে যায়।

ছ নম্বর রোডের মাঝামাঝি সুমিদের সুন্দর দোতলা বাড়ি। সামনে সবুজ ঘাসের লন। লনের তিনদিকে সার ধরা ফুলের গাছ লাগানো আর একপাশে মোটামুটি চওড়া একটা রাস্তা। গাড়ি ঢুকতে পারে। সেই রাস্তার পাশে সার ধরা টবেও ফুলের গাছ। গাছপালা এই বাড়ির মানুষ খুব পছন্দ করে। কিন্তু লনের মাঝখানটায় কোন গাছপালা নেই। সেখানে দামী পশমী কার্পেটের মত সবুজ ঘাস। গ্রাস কাটার দিয়ে রেগুলার কাটা হয় ঘাস। দেখতে ভারী সুন্দর জায়গাটা। সেখানে পড়ে আছে প্লাস্টিকের একটা টেবিল আর চারটে চেয়ার। চেয়ারগুলো শূণ্য।

ভেতরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়েছিল খোকা। কাকে ডাকবে বুঝতে পারে না। তখুনি দোতলার রেলিং থেকে ডাক আসে ও মা খোকা।

রেলিংয়ের দিকে তাকিয়ে খোকা কাউকে দেখতে পায় না। মানুষটা ততক্ষণে চঞ্চল পায়ে ছুটে এসেছে নিচে। তাকে দেখে খোকার মুখ ভরে যায় হাসিতে। সুমি পরে আছে নীল রঙের একটা ম্যাক্সি, সিল্ক জাতীয় কাপড়ের।

সুমি বলল, কিরে এতকাল পরে এলি, কথা বলছিস না কেন?

খোকা সুমির মুখের দিকে তাকায়। সুমির মুখটা গোলাকার, ফর্সা। স্বাস্থ্যও খুব ভাল সুমির। খানিক তাকিয়ে থাকলে দোকানের শো কেসে রাখা বড় সড় একটা পুতুলমনে হয়। খোকা একটু তাকিয়ে থাকে। এর আগে সে সুমিকে কখনও এতটা মনোযোগ দিয়ে দেখেনি। আসলে সুমির মুখের দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে মিলিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিল। কে বেশি সুন্দর। সুমি না খুকু। দুজনের সৌন্দর্য দুরকমের। তবে দু'জনকে পাশাপাশি দেখলে যে কেউ খুকুকে বেশি সুন্দর বলবে।

কিন্তু মনে মনে খোকা তা বলল না। খোকা বলল, খুকু সুমি তোমার চে অনেক বেশি সুন্দর। আমি সুমিকেই ভালবাসব।

সুমি বলল, কিরে চিনতে পারছিস না মনে হয়?

খোকার হাতটা আবার গালে উঠে গেল। তুই খুব সুন্দর হয়ে গেছিস সুমি।

তাই নাকি। সত্যি, খুব সুন্দর হয়ে গেছিস।

আগেও সুন্দর ছিলাম।

দেখিনি তো।

তুই কখন তাকিয়ে দেখেছিস আমাকে?

খোকা হেসে বলল, তাকিয়ে দেখেছি, খেয়াল করে দেখিনি।

আজ দেখছিস কেন?

ইচ্ছে হল। সুমি তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

চল বসি।

ওরা দুজন তারপর লনের চেয়ারে গিয়ে মুখোমুখি বসে।

www.shopnil.com

চেয়ারে বসে সুমি কানের ওপর দিয়ে দুটো হাত মাথায় একবার বুলিয়ে নেয়। সেই ফাঁকে খোকা দেখে সুমির চুল বয়কাট করা। সুমি বোধহয় দুএকদিন পর পর শ্যাম্পু করে। চুলগুলো লালচে। খোকা মেয়েদের লম্বা চুল পছন্দ করে? খুকুকে সে বলছিল তুমি কখন চুল কেট না। আজ এই মুহূর্তে সুমির বয়কাট করা চুল দেখে সে মনে মনে বলল, খুকু আমি আসলে বয়কাট করা চুলই পছন্দ করি। তোমার চে সুমির চুল অনেক বেশি সুন্দর।

সুমি বলল, অনেক দিন পরে এলি।

কতদিন?

এক বছরের বেশি হবে।

যাহ অতদিন হবে না।

ছোট ভাই চলে যাওয়ার পর তুই আর আসিস নি।

অপু গেছে কতদিন হল?

তোদের ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্ট হওয়ার পরপরই গেল না।

খোকার হাত আবার উঠে গেল গালে। সুমির ভাই অপু ছিল খোকাদের ক্লাসমেট। ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্ট আউট হওয়ার পর পর অপু চলে গেছে আমেরিকায়। সুমির বড় ভাই ভাবী আর তাদের ফুটফুটে দুটো বাচ্চা থাকে ডেলাসে। বড় ভাইয়ের অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল ইন্টারমিডিয়েটের পর অপুকে তিনি তাঁর কাছে নিয়ে যাবে।

সত্যি অপু চলে যাওয়ার পর এই বাড়িতে আর আসা হয়নি খোকার। অপু থাকতে একদিন দুদিন পর পরই আসত। এই লনটা তখনকার শীতকালে ছিল ব্যাডমিন্টন খেলার জায়গা। অপু সুমি খোকা এবং আর একটি মেয়ে, নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না খোকার, এখানে রোজ ব্যাডমিন্টন খেলত। অপু আর সুমি এক বছরের ছোট বড়। ওদের তুই তোকারী সম্পর্ক। আর খোকা হচ্ছে অপুর বন্ধু, খোকাকেও তুই তোকারি করত সুমি। এক বছরের বেশি দেখা না হলে কি হবে সম্পর্কটা নষ্ট হয়নি। খোকাকে দেখে সুমি ঠিক আগের মতই চঞ্চল পায়ে ছুটে এসেছে। তুই তোকারি করছে। আর সুমির যা স্বভাব, সব কথা সরাসরি বলে ফেলে। আগে ব্যাপারটা খোকা কখন খেয়াল করেনি। আজ করছে।

সুমি বলল, আমাদের কথা তুই একদম ভুলে গেছিস।

ভুলে গেলে আসতাম নাকি। তোদের বাড়ির আর লোকজন কইরে?

কাউকে দেখছি না।

আব্বুর বন্ধুরা এসেছে, আম্মুর বন্ধুরা এসেছে, সবাই মিলে ভিসিআর দেখছে দুপুর থেকে।

কি ছবি?

গান্ধী আর ইটি।

তুই দেখলি না?

আমার বোর লাগে। তুই এসে খুব ভাল করেছিস। আমি একদম একা হয়েছিলাম। চা খাবি?

খাই।

সুমি তারপর চেঁচিয়ে ডাকল, আজিজ, এই আজিজ দুকাপ চা দে।

তারপর খোকার দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল। তুই খুব এট্রাকটিভ হয়ে গেছিস।

শুনে খোকার ডানহাতটা আবার গালে উঠে গেল।

সুমি বলল, তাই তো, তুই সেভ করিস আজকাল?

আজই করলাম।

তুই সব সময় ক্লিন সেভ করবি। তোকে খুব মানায়।

আমাকে মানালে তোর কি।

বাহ সুন্দর লাগে না। তোকে অবশ্য আমার অনেক আগে থেকেই ভাল্লাগে।

জানি না তো। তুই কখন বলিস নি।

বললে কি হত?

কত কিছু হতে পারত।

লাভ। বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল সুমি। তার হাসির রেশ মিলিয়ে যেত না যেতেই চা নিয়ে এল আজিজ।

খোকা বলল, আজিজ তুই আমাকে সিগ্রেট এনে দিতে পারবি?

পারুম।

খোকা নিকার বুকারের বুক পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে দিয়ে বলল, পাঁচটা ফাইভ ফিফটি ফাইভ আর একটা ম্যাচ। আজিজ চলে যেতেই সুমি বলল, তুই বড় হয়ে গেছিস। সিগ্রেট খাস কবে থেকে?

বছর খানেক।

তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন স্বরে খোকা বলল, সুমি তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

কি কথা?

আমাকে তোর ভাল্লাগে?

খুব ভাল্লাগে।

তাহলে তুই আমাকে ভালবাস না।

যাহ তা কেমন করে বাসব।

কেন?

আমি যে ফরিদকে বলেছি।

কি বলেছিস?

ফরিদটা অনেকদিন আমার পেছনে লেগে আছে। চান্স পেলেই টেলিফোন করে। শুধু প্যান প্যান করে, সুমি তুই খুব সুন্দরী। আমি তোকে ভালবাসি।

তুইও ফরিদকে ভালবাসিস?

না। এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না।

ফরিদকে তুই তাহলে কি বলেছিস।

বলেছি ফরিদ আমি তোর কথা ভাবছি।

কবে?

কাল।

কতদিন ফরিদ তোর পেছনে লেগে আছে?

তিন চারমাস। রোজ টেলিফোন করে। এইভাবে টেলিফোন করলে আমি বিরক্ত হয়ে বলে ফেলব, ফরিদ তুই খুব সুন্দর। আমি তোকে ভালবাসি।

ভাগ্যিস কাল বলিস নি।

বললে কি হত।

তুই তাহলে আমাকে ভালবাসতি কেমন করে?

তুই সিওর আমি তোকে ভালবাসব?

তুইই তো বললি, আমি খুব এট্রাকটিভ।

হ্যাঁ তুই ফরিদের চে অনেক বেশি সুন্দর।

আজিজ সিগ্রেট নিয়ে এল তখুনি। তার হাত থেকে সিগ্রেট নিয়ে ফস করে ম্যাচ জ্বালাল খোকা। তারপর সিগ্রেটে টান দিয়ে বলল, তাহলে তুই আমাকে ভালবাসবি না কেন?

সুমি মুগ্ধ চোখে খোকার সিগ্রেট খাওয়া দেখছিল। বলল, সিগ্রেট খেলে তোকে খুব সুন্দর লাগে।

তুই ফরিদকে বলবি।

কি বলব?

বলবি আমি তোকে ভালবাসতে পারব না। আমি খোকাকে ভালবাসি।

www.shopnil.com

কিন্তু আমি যে তোর সম্পর্কে কিচ্ছু জানি না। এতদিন পর তোর সঙ্গে দেখা, এসে হুট করে বললি আমাকে ভালবাসিস। এর আগে কাউকে ভালবাসিস নি তো?

সঙ্গে সঙ্গে খোকার মনে পড়ল খুকুর কথা। তবু নির্বিকার মুখে সে বলল, না।

কি করে বুঝব।

তুই খোঁজ খবর নিয়ে দেখ।

সুমি খানিক চুপ করে কি ভাবে। তারপর বলে, আচ্ছা।

আচ্ছা শব্দটা শুনে খোকার বুক কাঁপে। খোঁজ নিয়ে সুমি যদি খুকুর কথা জেনে ফেলে। আবার ভাবে কিন্তু জানবে কেমন করে। খুকুকে সুমি খুঁজেই পাবে না।

সুমি বলল, আমি ফরিদকে মানা করে দেব। কিন্তু তুই ফরিদের মত রোজ আমাকে টেলিফোন করবি। রোজ বলবি আমাকে ভালবাসিস। শুনতে আমার বেশ লাগে। রোজ না বললে আমি কিন্তু ফরিদকে ভালবেসে ফেলব। তখন কিছু বলতে পারবি না।

ঠিক আছে।

খোকা উঠে দাঁড়াল। আমি তোকে রোজ টেলিফোন করব। তারপর বেরিয়ে যেতে যেতে খুকুর উদ্দেশে খোকা মনে মনে বলল, দ্যাখো, আমি যখন তখন কি রকম ভালবাসতে পারি।

সকাল এগারোটার দিকে দোতালার রেলিংয়ে এসে দাঁড়িয়েছে খুকু দেখে দূরে লাইটপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চু। চক্রাবক্রা একটা শার্ট আর জিনসের প্যান্ট পরা। চোখে সানগ্লাস। বোঝা যায় খুকুদের বাড়ির দিকেই তাকিয়ে আছে বাচ্চু। এই প্রথম বাচ্চুকে দেখে চঞ্চল হয়ে ওঠে খুকু। বাচ্চুর কাছে নিশ্চয় খোকার খবর পাওয়া যাবে।

সেদিন খুকুকে ইফতেখারের ঘরে একা ফেলে রাগ করে চলে গিয়েছিল খোকা। খুকু খুব কেঁদেছিল। কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে সন্ধ্যের মুখে মুখে রিকশা নিয়ে ফিরে এসেছিল বাড়ি। মনটা খুব খারাপ হয়েছিল তার। বাড়ি এসেই সোজা ঢুকে গেছে বাথরুমে। তারপর সাবান দিয়ে খুব করে মুখ ধুয়ে অনেকক্ষণ বাদে বেরিয়ে এসেছে। সে যে খুব কেঁদেছে এটা যেন তাকে দেখে কেউ বুঝতে না পারে। কিন্তু কান্নার দাগ না হয় ধোয়া যায়, মন খারাপটা কেমন করে ধোবে খুকু।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে খাবার টেবিলে বিকেলের নাস্তা সাজিয়ে মামনি বসে আছেন। খাবার টাইম ছাড়া মামনিকে তো আর পাওয়াই যায় না। শুধু বই পড়েন।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে খুকু এসে বসল। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, আমি তো চা ছাড়া আর কিছু খাব না মামনি। মুন্নিদের বাসায় অনেক কিছু খেয়েছি।

মামনি তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছিল খুকুর দিকে। গম্ভীর গলায় বলল, তোর মুখচুখ ওরকম দেখাচ্ছে কেন? কেঁদেছিস নাকি?

শুনে চমকে ওঠে খুকু। তারপর আবার জোর করে হেসে বলে, কি বলছ। কাঁদব কেন। কত মজা করে এলাম মুন্নিদের বাসায়।

নিশ্চয় কেঁদেছিস। না কাঁদলে কার মুখ চোখ অমন দেখায় না। কার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস নাকি? মিথ্যে কথা খুকু একদম বলতে পারে না। উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। মামনির কথা শুনে খুকুর একবার ইচ্ছে করে সব বলে দেয়। ঠোঁটে প্রায় এসেই গিয়েছিল। কষ্টকরে চেপে রাখে। খোকার কথাই কেউ জানে না। তার ওপর কোর্টের ওসব কাগজে তার সই নিতে চেয়েছিল খোকা। সই করলে খোকার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যেত, এ সব শুনলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। রাতের বেলাই পাপার কানে উঠবে কথাটা। খোকার ঠিকানা নিয়ে পাপা তাহলে যা তা করে ফেলবেন। না ওসব নিয়ে সত্য কথাটা খুকু কখন বলবে না।

চায়ে চুমুক দিয়ে খুকু একটু ভারি স্বরে বলল, তুমি আমাকে এতটা ছেলেমানুষ ভাব কেন। কাঁদতে যাব কেন আমি। তাছাড়া আমি কি কখন তোমার সঙ্গে মিথ্যে বলেছি।

মামনি হেসে ফেলেন। তোর মুখটা অন্যরকম লাগছে, তাই বললাম। তুই ছেলেমানুষ নয়ত কি।

আমাকে আর ছেলেমানুষ বলবে না। আমি বড় হয়ে গেছি। দুমাস বাদে ইন্টারমিডিয়েট দেব।

খুকুর চিবুকে আলতো করে হাত ছুঁইয়ে মামনি বলল, খুব বড় হয়ে গেছিস না। বলে কি মেয়ে। সেদিন মাত্র হলি তুই।

খুকু বলল, দুপুরে খেয়েছিলে তো?

তোর পাপা একদম খেতে চাননি। বাড়ি ফিরে তোকে না দেখে খানিক পায়চারী করল। তারপর আমি যখন বললাম তুই মুন্নির জন্মদিনে গেছিস, দুপুরে ফিরবি না, শুনে খুব মন খারাপ হয়ে গেল। খাবার টেবিলে বসেছিল ঠিকই কিন্তু খেতে পারেনি।

পাপার জন্যে খুকুর খুব কষ্ট হয়েছিল। তাকে টেবিলে না দেখলে খেতে পার না পাপা। ছটফট করেন। মামনি ঠিক অতটা নয়। কিন্তু পাপা। সেদিনই খুকুর একটা কথা মনে হয়েছিল, তার বিয়ে হয়ে গেলে, সে এই বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে পাপা কেমন করে খাবার টেবিলে বসবেন।

খুকু বলল, পাপাকে বলো আমি বড় হয়ে যাচ্ছি। সে যেন অভ্যেসটা পাল্টায়।

বড় হয়ে যাচ্ছিস তো কি হয়েছে। অভ্যেস পাল্টাতে হবে কেন?

বাহ আমি কি চিরকাল এই বাড়িতে থাকব।

কোথায় যাবি?

আমার বুঝি বিয়ে হবে না। বলেই খুকু খুব লজ্জা পেয়ে গেল। মামনির মুখের ওপর নিজের বিয়ের কথা খুকু কেমন করে বলল।

মামনি কিন্তু ওসব খেয়াল করল না। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, বিয়ে হলেও তোকে এ বাড়ি ছেড়ে যেতে দেব না। তোর বরকে ঘরজামাই করে রাখব। তোর পাপা আমাকে বলেছেন।

তখন আবার খোকার কথা মনে পড়েছে খুকুর। খোকার সঙ্গে যদি তার বিয়ে হয়, খোকা কি ঘরজামাই থাকতে রাজি হবে। যা রাগী স্বভাবের খোকা। কোন কথা বুঝতে চায় না। কি রকম খারাপ ব্যবহারটা তার সঙ্গে করল আজ। খুকু কত বোঝাল, বুঝল না। কাঁদল, গ্রাহ্য করল না। ইফতেখারের ঘরে তাকে একা ফেলে চলে গেল। বলল, প্রেম করার কত মেয়ে আছে।

সত্যি সত্যি খোকা যদি অন্য কাউকে ভালবেসে ফেলে।

সেদিন সারারাত খুকু কেবল এই কথাটা ভেবেছে। পরদিন খোকাকে টেলিফোন করেছে। খোকার ছোট ভাবী বলেছেন, খোকা বাড়ি নেই। কোথায় গেছে কিছু বলতে পারলেন না।

তারপর আবার করেছে খুকু। আবার। আবার। আবার। খোকাকে পাওয়া যায়নি। প্রতিদিন একবার দুবার টেলিফোন করেও খোকাকে ধরতে পারেনি খুকু। হতাশ হয়েছে। মন খারাপ করে ভেবেছে, খোকা বাড়ি থেকেও মানা করে দেয়। সে কি আর খুকুর সঙ্গে কথা বলবে না। কোন সম্পর্ক রাখবে না। তাহলে খুকুর কি হবে। খোকাকে ছাড়া সে যে আরকাউকে ভালবাসতে পারবে না।

প্রতিদিনই এসব ভেবে খুকু তারপর গোপনে কেঁদেছে। সে কি নিজেই খোকাকে খুঁজতে যাবে। কিন্তু কোথায় পাবে খোকাকে। ওদের বাড়ি তো সে চেনে না। ইফতেখারদের ওখানে গিয়ে খোঁজ নেয়া যায়। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুবে কেমন করে। কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। দুমাস আছে পরীক্ষার। সকাল দুপুর সন্ধ্যা তিনবেলা মাস্টার আসে খুকুকে পড়াতে। এ সময় বাড়ি থেকে তাকে কেউ বেরুতে দেবে না। খুকু আর কি করে। গোপনে কেবল কাঁদে। ইস কি যে ভুল করল, কেন যে সই করল না কাগজটায়। সই করে দিলে কি হত। কেউ তো জানত না কথাটা। জেনে গেলে পাপা মামনি খুব দুঃখ পেতেন। মেরে তো ফেলতেন না। খোকার জন্যে এখন যে কষ্টটা পাচ্ছে খুকু এরচে বড় কষ্ট কি পৃথিবীতে আর আছে।

তারপর থেকে খুকু কেবল এসব ভাবত। ভাবত আর মন খারাপ করে দোতলায় রেলিংয়ে এসে

www.shopnil.com

দাঁড়াত। স্যারা পড়িয়ে চলে গেলে।
একদিন রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে দূরে রাস্তার লাইটপোস্টের তলায় বাচ্চুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল খুকু। দেখে খুব চঞ্চল হয়ে গেল। দারোয়ানকে ডেকে বলল, ওই যে লাইটপোস্টের তলায় ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে ওকে ডেকে আন।
তারপর নিজে এসে দাঁড়াল নিচের বারান্দায়। একটা কাজের ছেলে উঠছিল দোতলায় তাকে ডেকে বলল, নিচের ড্রয়িংরুমটা খুলে দে। আমার বন্ধু এসেছে। চা দিস।
খুকু নিশ্চিত মামনি এসবের কিছুই টের পাবেন না। মামনি এখন তো তাঁর স্টাডিরুমে।
খুকুদের বাড়ি ঢুকেই সানগ্লাসটা খুলে ফেলল বাচ্চু। তারপর কোন ভনিতা না করে বলল, তোদের দারোয়ানটাকে দেখে দৌড় মারতে চেয়েছিলাম। পরে বলে কি আপা ডাকছে।
খুকু মৃদু হেসে বলল, আমি দোতলার রেলিং থেকে তোকে দেখেই ডাকতে পাঠিয়েছিলাম।
আমিও তোকে দেখতে পেয়েছিলাম। ইশারা করব দেখি দারোয়ানটা দূর থেকে হা করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ও ব্যাটাকে ফাঁকি দেয়ার জন্যেই তো সানগ্লাসটা পরে এসেছি।
কি মনে করে এলি?
তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। চল বসি।
আয়।
ওরা দুজন তারপর ড্রয়িংরুমে গিয়ে ঢোকে। সঙ্গে সঙ্গে কাজের ছেলেটা ট্রে ভর্তি চা কেক বিস্কিট নিয়ে আসে। খুকু ছেলেটাকে বলল, তুই যা।
তারপর বাচ্চুকে বলল, খা।
বাচ্চু একটা কেকে কামড় দিয়ে চায়ে চুমুক দেয়। তুই অত রোগা হয়ে গেছিস কেন?
আমার কিছু ভালাগে না।
খোকার সঙ্গে দেখা হয়েছে আর?
না।
টেলিফোন করিস নি?
করেছিলাম। ধরেনি। বোধহয় বাড়ির সবাইকে বলে দিয়েছে আমি টেলিফোন করলে যেন ডেকে না দেয়।
খোকাটা বেজায় রাগী।
অত রাগ ভাল না।
তুই ওর কথায় রাজী হলি না কেন?
ওটা কোন ব্যাপারই না। এক্ষুনি আমাদের বিয়ে হওয়ার দরকারটা কি। আমার কি অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, না আমি কোথাও চলে যাচ্ছি। ওকে অনেক বোঝালাম। কিছুতেই বুঝতে চাইলে না।
জানি। সব কথা শুনেছি।
খোকা বলেছে?
না।
তাহলে?
বাচ্চু হেসে বলল, তোদের দুজনকে ফেলে আমি আর ইফতেখার বেরিয়ে যাওয়ার আগে টেপ রেকর্ডারে একটা খালি ক্যাসেট ভরে রেখে গিয়াছিলাম। তোদের সব কথা টেপ হয়ে গেছে। সন্ধ্যের পরে ফিরে গিয়ে আমি আর ইফতেখার শুনেছি।
ক্যাসেটটা কই?
খোকার কাছে। ইফতেখার গিয়ে দিয়ে এসেছে।
খোকার সঙ্গে তোর দেখা হয়নি?
রোজই তো হয়।

আমার কথা কিছু বলে না?
না। আমি আর ইফতেখার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোর কথা জিজ্ঞেস করি। বলে, তোর সঙ্গে ও আর কোন সম্পর্ক রাখবে না।
শুনে খুকুর চোখ ছলছল করে ওঠে। খুকু কি কেঁদে ফেলবে।
বাচ্চু বলল, আমি অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি। কাজ হচ্ছে না। বলে, ও নাকি আর একটা প্রেম করবে।
কার সঙ্গে?
সেটা বলতেই তো এলাম?
বল না।
দাঁড়া সিগ্রেটটা ধরিয়ে নিই। বলেই বাচ্চু পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে। ম্যাচ বের করে। তারপর সিগ্রেট ধরিয়ে বলে, আমাদের এক বন্ধুর বোনের সঙ্গে খোকার প্রায় হয়ে এসেছে। তোর সঙ্গে রাগারাগি করার পর খোকা চারদিন বাড়ি থেকে বেরোয়নি। তারপর ডিসিশান নিয়েছে।
কি নাম মেয়েটির?
সুমি।
কোথায় থাকে?
ধানমন্ডি ছ নম্বর রোডে।
দেখতে কেমন?
খুব সুন্দর। তবে তোর মত নয়।
এ কথায় খুকুর খুশি হওয়া উচিৎ ছিল কিন্তু সে হঠাৎ কেঁদে ফেলে। বাচ্চুর একটা হাত দুহাতে জড়িয়ে ধরে। বাচ্চু আমি এখন কি করব।
খুকুকে কাঁদতে দেখে বাচ্চু থতমত খেয়ে যায়। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, তুই অত নার্ভাস হচ্ছিস কেন। আমি বলেছি না, তোকে হেলপ করব। দাঁড়া, সুমিদের বাসার ঠিকানা কিংবা টেলিফোন নাম্বারটা জোগাড় করে নিই। সুমিকে টেলিফোনে সব জানিয়ে দেব।
কি জানিয়ে দিবি?
বলব খোকার সঙ্গে তোর প্রেম। অনেক দিনের।
তাহলে কি হবে?
বাহ একটা মেয়ে যখন জেনে যাবে তার খোকার আরেকটি প্রেম আছে তাহলে সে কি খোকাকে আর পাত্তা দেবে।
বাচ্চু প্লিজ, তুই আমার এই উপকারটা কর।
আমি তো এজন্যেই এসেছি। তুই নার্ভাস হবি না। আমি সব ঠিক করে দেব। তবে আমি তোকে যা যা বলব তাই কিন্তু করতে হবে।
খুকু বলল, আচ্ছা।

বাচ্চুকে দেখে খোকা খুব অবাক। কি রে হঠাৎ তুই?
বাচ্চু কিছু বলার আগেই শুনতে পেল খোকার ঘরের ছোট টুইন ওয়ানে খুকুর গলা। ভালবাসলে এত কষ্ট পেতে হয় জানলে আমি কখন তোমাকে ভালবাসতাম না।
দুপুরের পরপর নিজের রুমে বসে খোকা সেই ক্যাসেটটা শুনছিল। জিনসের প্যান্টের ওপর পাতলা একটা স্যান্ডো গেঞ্জি পরা। মাথার চুল এলমেলো। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়েছিল। মাথার কাছে ছোট্ট টুইন ওয়ান। তাতে সেই ক্যাসেটটা বাজছিল। ঠিক তখুনি বাচ্চু এসে হাজির। এই

www.shopnil.com

বাড়িতে ঢুকতে খোকার বন্ধুদের কোন বাঁধা নেই। যখন তখন আসতে পারে তারা।
বাচ্চুকে দেখে উঠে বসল খোকা। তারপর টেপ রেকর্ডার বন্ধ করল। বাচ্চু বলল, খবর কি তোর?
ভালই।
খুকুর খবর কি? যেন ওসব ব্যাপারে কিছুই জানে না বাচ্চু।
খোকা বলল, ওর কোন খবর আমি রাখি না। আমি আর একটা প্রেম করছি।
বাচ্চু সবই জানে। ইফতেখারের কাছ থেকে জেনেছে। মেয়েটির নাম সুমি। তাদের এক ক্লাশমেটের বোন। ধানমন্ডি ছ নম্বর রোডে বাড়ি, সব।
কিন্তু খোকার কাছে সব চেপে গেল বাচ্চু। অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি।
হ্যাঁ।
কি নাম মেয়েটির? আমি চিনি?
নাম সুমি। তুই চিনবি না।
তাহলে খুকুর কি হবে?
কি হবে তার আমি কি জানি। যে আমার কথা শোনে না তার সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রাখব না।
তাহলে ওই ক্যাসেটটা শুনছিস কেন?
ক্যাসেটটা ইফতেখার আমাকে দিয়েছিল। শোনা হয়নি। আজ হঠাৎ মনে পড়ল বলে শুনছি।
বাচ্চু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু খুকুটা বড় ভাল মেয়ে ছিলরে।
খুকুর চে সুমি অনেক বেশি ভাল মেয়ে।
দেখতে কেমন?
দারুণ।
আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবি না?
দেব। দাঁড়া, এখুনি টেলিফোন করছি। বলে খোকা উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে টেলিফোন সেটটা নিজের ঘরে টেনে আনে। তারপর দরোজা ভিড়িয়ে টেলিফোন নিয়ে খাটের ওপর বসে।
বাচ্চু বলল, এ সময় টেলিফোন করলে ওদের বাসার কেউ রাগ করবে না?
আরে না। সুমিরা খুব ফ্রি। আমি যখন ইচ্ছে টেলিফোন করি। কেউ মাইন্ড করে না।
সুমিকে একদিন ইফতেখারের ওখানে আসতে বল না।
কবে?
বাচ্চু মনে মনে কি হিশেব করে পাঁচদিন পরে একদিন দুপুরের ঠিক পরপর সময় দিল। শুনে খোকা খুব খুশি। বলল, ইফতেখারের সঙ্গে আমার নাও দেখা হতে পারে। তুই সব ব্যবস্থা করে রাখিস।
ঠিক আছে।
খোকা তারপর টেলিফোনের নাম্বার ঘোরায়। বাচ্চু এসে বসে তার পাশে। তারপর আড়চোখে খোকার ঘুরিয়ে যাওয়া নাম্বারটা দেখে মুখস্ত করার চেষ্টা করে।
প্রথম বারে হল না। বোধ হয় কেটে যায়। বিরক্ত হয়ে আবার নাম্বার ঘোরায় খোকা। আর তাতে পুরো নাম্বার মুখস্থ হয়ে যায় বাচ্চুর। মনে মনে ভারি খুশি হয় সে। এত সহজে কাজটা হয়ে যাবে কে জানত।
খোকা বলল, হ্যালো কে? সুমি। বাহ তুমিই ধরেছ। ঘুমোওনি?
ওপাশ থেকে কি বলল বাচ্চুর কি তা বোঝার কথা। কিন্তু বাচ্চুর খুব ইচ্ছে করছে সুমির কথা শোনার। তাহলে আর সুবিধে হবে।
বাচ্চু উঠে গিয়ে যে কানের সঙ্গে রিসিভার লাগিয়েছে খোকা, খোকার সেই কানের কাছে নিজের কান নিয়ে রিসিভারের পিঠে ছুঁইয়ে রাখে। খুব অস্পষ্ট হলেও শোনা যাবে কথা।
বাচ্চুর এরকম ভাব দেখে রাগ করার কথা ছিল খোকার। কিন্তু রাগ করে না সে। ওরা সব বন্ধুরা তো এরকমই। সবাই সবার কথা জানে।
খোকা বলল, কি করছিলে?
বাচ্চু শুনতে পেল ওপাশ থেকে সুমি বলছে, এই খোকা তুই আমাকে অত তুমি তুমি করে বলছিস কেন?
প্রেম করলে তুই তুই করে বলা যায়?
যাবে না কেন?
তোর সঙ্গে বিয়ে হলে আমি তোকে তুই তুই করে বলতে পারব?
তুই কি তোর বরকে তুই তুই করে বলতে পারবি?
সে যখন বিয়ে হয় তখন দেখা যাবে।
আয় না এখন থেকেই তুমি বলাটা প্রাকটিস করি।
ধুৎ ওসব করে সময় নষ্ট করা যাবে না। বল।
কি বলব?
বাহ এতক্ষণ ধরে টেলিফোনে কথা বলছিস, কিন্তু একবারও তো সেই কথাটা বললি না। ফরিন তো টেলিফোন তুলেই বলত।
ও ভুলে গিয়েছিলাম, তোকে আমি ভালবাসি সুমি। এবার তুই বল। আমিও তোকে।
কি?
ভালবাসি।
শোন তুই আমার সঙ্গে দেখা করবি?
কবে?
খোকা পাঁচদিন পরের, দুপুরের ঠিক পরপর সময় দিল। এবং ইফতেখারের বাসার ঠিকানা বলে দিল। বাড়ি ঢুকেই দেখবি দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়ির সঙ্গে যে রুমটা, দরোজা খোলা থাকবে, সোজা ঢুকে যাবি।
সুমি খানিক কি ভাবল। তারপর বলল, আচ্ছা।
ঠিক আছে। তুই এখন ঘুমোতে যা। বলার সঙ্গে ওপাশে টেলিফোন নামিয়ে রাখল সুমি।
খোকা বলল, দেখলি সুমি আমার কথা কেমন শোনে।
বাচ্চু বলল, তাইতো। তুই দোসত খুব লাকি। নে সিগ্রেট খা। বাচ্চু নিজের পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে।

খোকার ওখান থেকে বেরিয়ে বাচ্চু একটা পাবলিক টেলিফোন বক্স খুঁজে বের করে। তার আগে একটা দোকানদারকে পটিয়ে এক টাকার একটা নোট ভাঙ্গিয়ে চারটে চকচকে সিকি নিয়েছে। চারটে সি[illegible]তেই হয়ে যাবে। খুব বেশি কিছু তো আর বলতে হবে না।
মুখস্থ নাম্বারটা খুব যত্ন করে ঘোরালো বাচ্চু। সঙ্গে সঙ্গে ওপাশে মেয়েলি কণ্ঠস্বর বলল, হ্যালো।
বাচ্চু বলল, সুমি আছে?
বলছি। আপনি কে?
আমাকে আপনি চিনবেন না।
সুমি বিরক্ত হয়ে বলল, তাহলে টেলিফোন করেছেন কেন?
আপনার উপকারের জন্যেই করেছি।
কি বলব বলুন। আমি ঘুমোব।
আপনি খোকাকে চেনেন?
খুব ভাল করে চিনি। খানিক আগেও টেলিফোনে কথা বলেছি।

www.shopnil.com

খোকার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?
তা দিয়ে আপনার দরকার কি?
খোকাকে একজন ভালবাসে আপনি জানেন?
খুব ভাল করে জানি।
বলুন তো সে কে?
সে তো আমিই। খোকা সুমিকে ভালবাসে।
জ্বী না।
তাহলে? সুমির আগ্রহ বহুগুণ বেড়ে যায়।
খুকু নামের মেয়েটার সঙ্গে খোকার অনেক দিনের প্রেম। ওদের বোধ হয় বিয়েও হয়ে গেছে।
কি বলছেন?
জবাব না দিয়ে বাচ্চু একটা সিকি ফেলে দিল বাক্সে। তারপর বলল, মেয়েটির নাম খুকু। ইস্কাটনে থাকে।
বাসার নাম্বারটা বলব।
কেন?
আমি খুকুর সঙ্গে দেখা করব।
বাচ্চু এক মুহূর্ত কি ভাবে। তারপর নাম্বারটা বলে দেয়।
সুমি বলল, আপনি আমার খুব উপকার করল। আমি এমন একজনকে খুঁজছিলাম যার কাছ থেকে খোকা সম্পর্কে সব জানা যাবে। থ্যাংক ইউ।
আর শুনুন, খোকা যদি আপনাকে কোথাও যেতে বলে যাব না। খোকা ছেলেটা ভাল নয়।
ও তো আমাকে পাঁচদিন পর একটা বাসায় দেখা করতে বলেছে।
যাব না সেখানে। খোকা টেলিফোন করলেও ধরবেন না। ওই মেয়েটি, মানে খুকু সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে নিন।
রিসিভার নামিয়ে রাখে বাচ্চু। তারপর মনে মনে নিজেকে একটা ধন্যবাদ দেয়। সাবাস বাচ্চু খুকুর জন্যে একটা অন্তত ভাল কাজ করলে তুমি।
বাচ্চু একটা সিগ্রেট ধরায়। তারপর ভাবে খুকুকে তো এসব জানাতে হয়। সুমি তাদের বাসায় যেতে পারে।
বাচ্চু তারপর আর একটা এক টাকার নোট ভাঙিয়ে চারটে নতুন সিকি নেয়। খুকুকে টেলিফোন করে বলে দেয়, যে কোনদিন সুমি তোদের বাড়ি যেতে পারে। গেলে সরাসরি বলে দিবি খোকার সঙ্গে তোর বহুদিনের প্রেম। দরকার হলে বলবি বিয়ে হয়ে গেছে। সবাই জানে। আর তুই ইফতেখারের বাসায় আসবি। দরকার আছে।
তারপর পাঁচদিন পরের ঠিক দুপুরের পর সময় দিল বাচ্চু।

বিকেলবেলা খুকু বসেছিল দোতলায় রেলিংয়ে। হাতে চায়ের কাপ। আনমনে চুমুক দিচ্ছিল। পেছনে খুকুর ঘরের ভেতর বিশাল ডেকে বাজছিল ভারি মিষ্টি একটা মিউজিক। বিকেলবেলা এই মিউজিকটা আজকাল প্রায় শোনে খুকু। দারুণ লাগে।
ঠিক সেই সময় একটা নীল রঙের গাড়ি এসে থামে খুকুদের গেটের সামনে। গাড়িটা প্রথমে খেয়াল করেনি খুকু। কিন্তু গাড়ি থেকে খুকুর বয়সি পাঁচটি মেয়ে যখন দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলছে, তখন দেখতে পায় খুকু। মেয়েগুলো খুব স্মার্ট। থ্রিপিস পরা দুজন, একজন স্কার্ট পরা একজন সাধারণ একটা শাড়ি পরা। আর একজন জিনসের প্যান্ট আর লম্বা শার্ট পরা। চুল বয়কাট করা।

দেখে খুকু চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে রেলিংয়ে ঝুঁকে দারোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার?
সঙ্গে সঙ্গে পুরো দলটি ওপরের দিকে তাকায়। বাচ্চুর কথা মনে পড়ে খুকুর। তাহলে খুকু যা বোঝার বুঝে ফেলে। দারোয়ানকে বলে, ওপরে পাঠিয়ে দাও।
মিনিটখানে পরে সেই পাঁচজন এসে খুকুদের দোতলায় ড্রয়িংরুমে ঢোকে। তার আগে ড্রয়িংরুমে ঢুকে এয়ারকুলার চালিয়ে দিয়েছে খুকু। কাজের ছেলেটাকে ডেকে পাঁচজনের চা নাস্তা দিতে বলেছে।
খুকুদের ড্রয়িংরুমে ঢুকে মেয়েগুলো একটু থতমত খেয়ে যায়। বোঝা যায় এতটা তারা আশা করেনি।
খুকু বলল, বসুন।
সোফায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতে বসতে বয়কাট করা মেয়েটি বলল, আপনার নাম খুকু।
হ্যাঁ। কিন্তু আমি আপনাদেরকে ঠিক
আমার নাম সুমি। এরা সবাই আমার বন্ধু।
ও। কি ব্যাপার বলুন তো।
স্কার্ট পরা মেয়েটি বলল, আমরা খুব একটা দরকারে এসেছি।
বলুন।
শাড়ি পরাটি বলল, আপনি খোকা নামের কাউকে চিনেন?
চিনি।
থ্রি পিস পরা একটি বলল, কি রকম চেন?
মানে?
দু নম্বর থ্রি পিস বলল, খোকার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?
ঠিক তখুনি ট্রে ভর্তি খাবার আর চা নিয়ে এল কাজের ছেলেটি। এসে ঘরে আস্তে ধীরে পাঁচটি কাপে চা ঢালল। তন্তরি আর ন্যাপকিন সাজিয়ে রাখল প্রত্যেকের সামনে।
খুকু বলল, তুই যা।
ছেলেটা চলে যাওয়ার পর খুকু বলল, নিন।
সুমি ছাড়া আর সবাই যার যার তন্তরিতে খাবার তুলে নিলো।
খুকু সুমিকে বলল, আপনি নিলেন না?
আমি খাব না।
চা টা অন্তত খান। আমাদের বাড়ি এসে কেউ কখন না খেয়ে যায় না।
সুমি চা ঢেলে নিল।
থ্রিপিস পরা সেই মেয়েটি বলল আপনি কিছু খাবেন না।
আমি এইমাত্র চা খেয়েছি।
শাড়ি পরা মেয়েটি বলল, খোকার সঙ্গে আপনার
খুকু হেসে হেসে বলল, বুঝতে পার নি ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি।
সুমি বলল, আপনার মুখে শুনতে চাই।
খোকা আমাকে ভালবাসে।
মিথ্যে কথা।
আমাদের সম্পর্কটা অনেক দিনের।
বিশ্বাস করি না।

www.shopnil.com

আপনার বিশ্বাস অবিশ্বাসে আমার কি এসে যায়।
স্কার্ট পরা মেয়েটি বলল, আপনি সিওর খোকা আপনাকে ভালবাসে?
ওভার সিওর। কারণ আমাদের মাত্র কদিন হল।
সুমি বলল, কি?
বিয়ে হয়ে গেছে।
এই প্রথম একটি জলজ্যান্ত মিথ্যে বলতে খুকুর একটুও গলা কাঁপল না। একটুও আটকাল না।
শুনে সবাই থমকে গেল। খুকুর সে সব গ্রাহ্য না করে বলল, দু বাসায়ই মেনে নিয়েছে ব্যাপারটা।
আমরা দুজনেই এখন পড়াশুনো করব। পড়াশুনো শেষ হলে ফাংসানটা হবে।
কথাগুলো বলে খুকু খুবই অবাক হল। মজাও পেল। মিথ্যে বলা তো ভারি মজার। একাবার শুরু করলে বেশ বলা যায়।
সুমি বলল, কিন্তু খোকা যে আরেকজনকে ভালবাসে আপনি তা জানেন?
জানি। কিন্তু ভালবাসা নয়। কেউ কার সঙ্গে মিশলে কিংবা কথা বললেই ভালবাসা হয়ে যায় না।
সেই মেয়েটি খুব ভুল করছে। কারণ খোকাকে আমি সবচে ভাল চিনি।
ট্রাউজার পরা একজন বলল, চল সুমি যাই। আপনাদের যা জানার জানা হয়ে গেছে।
পাঁচজন একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। খুকু দাঁড়িয়ে বলল, সুমি আমি খুব দুঃখিত। আপনার জন্যে আমার কিছু করার নেই।
সুমির মুখটা তখন খুবই বিষণ্ন হয়ে গেছে। ম্লান হেসে বলল, না না আপনার দোষ কি।
খুকু পুরুষ মানুষের মত ডানহাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, দেখা হবে।
সুমি তার হাতটা মুহূর্তের জন্যে ছুঁয়ে দিয়ে তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে যায়।

ইফতেখারের রুমে ঢুকে খোকা খুব অবাক। সেই রিভলভিং চেয়ারটা আজ আবার আনা হয়েছে এই ঘরে। তাতে দরোজার দিকে পেছন ফিরে আছে একটি মেয়ে। মেয়েটির পেছন থেকে দেখে খোকা সিওর হয়ে যায় সুমি এসে গেছে।
খোকা পা টিপে টিপে চেয়ারটার পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর দুহাতে মেয়েটির চোখ টিপে ধরে। বল তো আমি কে?
মেয়েটি একটুও নড়ল না। স্পষ্ট গলায় বলল, তুমি আমার প্রেম।
গলার স্বর শুনে স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে ওঠল খোকা। সঙ্গে সঙ্গে রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরে গেল তার দিকে। চেয়ারে বসে আছে খুকু। খিলখিল করে হাসছে সে।
খোকা কি বলতে যাবে তখুনি এটাচড বাথরুমের দরোজা খুলে বাচ্চু আর ইফতেখার একতালে হাততালি বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে এল। দুজনের মুখেই হাসি। দেখে থমকে ওঠল খোকা, কি হচ্ছে কি?
হাততালি থামিয়ে ইফতেখার বলল, হবে কি আবার। খুকুকে দেখে অবাক হয়েছিস নাকি?
খোকা বাচ্চুর দিকে তাকাল।
বাচ্চু বলল, ও আজ তো সুমির আসার কথা ছিল, না?
খোকা কথা বলে না।
খুকু রিভলভিং চেয়ারেই বসা ছিল। বলল, সুমি আমাদের বাসায় গিয়েছিল।
খোকা চমকে উঠল। কবে?

তিন চারদিন আগে। সঙ্গে ওর আর চারটি বন্ধু ছিল।
ছেলে বন্ধু?
না সবগুলোই মেয়ে।
বাচ্চু বলল, হ্যাঁ আমিই সুমিকে খুকুর কথা জানিয়েছি। বাসা চিনিয়ে দিয়েছি। এবং
ইফতেখার বলল, এবং আমরা দুজনেই আজ খুকুকে এখানে আসতে বলেছি।
বাচ্চু বলল, এবং সুমিকে এখানে আসতে মানা করেছি।
সব শুনে হতাশ হয়ে খোকা একটা সোফায় বসে পড়ল। তার মুখে আলগা একটা রাগ ভাব। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে যে খুব খুশি হয়েছে বোঝা যায়।
ইফতেখার পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে দিল খোকাকে। নে সিগ্রেট খা।
খোকা সিগ্রেট নেয়। বাচ্চু ম্যাচ বের করে। তারপর তিনজন এক কাঠিতে সিগ্রেট ধরায়।
বাচ্চু বলল, সব জেনে কেটে পড়েছে সুমি। এখন আমরাও কাটছি।
খুকুর সঙ্গে সব ঠিকঠাক করে নে দোস্ত।
ইফতেখার বলল, আবার যদি কখন খুকুর সঙ্গে উল্টাপাল্টা ব্যবহার করিস তাহলে তোকে আমরা প্যাদানি লাগাব। এখন তুই আর আমাদের বন্ধু না। খুকু আমাদের বন্ধু। ওর জন্যে আমরা আছি। ওর জন্যে আমরা সব করব।
খোকা হেসে ফেলল।
বাচ্চু আর ইফতেখার বেরিয়ে যাবার পর খুকু উঠে গিয়ে দরোজাটা বন্ধ করে। তারপর খোকার পাশে এসে বসে। খোকার একটা হাত জড়িয়ে ধরে বলে, রাগ করেছ।
খোকা কথা বলে না।
খুকু বলল, কথা বলবে না?
খোকা অভিমানের গলায় বলল, তুমি আমার কথা শুনলে না কেন?
এখন থেকে শুনব।
সত্যি?
সত্যি।
খোকা হঠাৎ করে লাফিয়ে ওঠে। তারপর খুকুকে টেনে তুলে পাজা কোলে নেয়। তারপর সারা ঘর চক্কর খেতে খেতে চেঁচিয়ে গাইতে থাকে, হাম তুম এক কামারে মে বন্ধ হো অর চাবী খো যায়।

www.shopnil.com

পিঞ্জর

মিনুর চার বছরের মেয়ে মম ভারি দুরন্ত হয়েছে। দুপুর বারটার দিকে মমকে যখন খাওয়াতে বসায়, মিনুর মেজাজ একদম ঠিক থাকে না। খাবারের প্লেট হাতে মমর পিছু পিছু সারা ফ্ল্যাট ছুটোছুটি করতে হয়।

মিনুদের ফ্ল্যাটটা ছোট। দুটো মাঝারি সাইজের রুম, ছোট্ট ডাইনিং স্পেস, একজন মানুষ কায়ক্লেশে রান্নাবান্না করতে পারে এমন কিচেন আর ঠিক কিচেনের সমান মাপের বাথরুম। এই ফ্ল্যাটের ভাড়া সাতাশ শ টাকা।

অবশ্য ইলেকট্রিসিটি গ্যাস পানি সব ওই সাতাশ শ টাকার মধ্যে। তাও ফ্ল্যাটটি নাকি গ্রাউন্ড ফ্লোরে বলে, রাস্তার সঙ্গে বলে ভাড়া তিনশো টাকা কম।

বাড়িটি চারতলা। চারতলায় মোট আটটি ফ্ল্যাট। মিনুদের ফ্ল্যাট ছাড়া বাকি প্রতিটির ভাড়া তিন হাজার করে। মিনুদেরটি তিনশো টাকা কম হওয়ার আরেকটি কারণ এই ফ্ল্যাটের বারান্দা ব্যবহার করা যায় না।

ফ্ল্যাটের বারান্দাটি রাস্তার সঙ্গে এবং খোলামেলা। তিন ফুট উঁচু একটা দেয়াল তুলে রাস্তা থেকে আলাদা করা হয়েছে। মিনুদের ড্রয়িংরুম হচ্ছে বারান্দার সঙ্গের রুমটি। ওদিক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবার দরোজাও আছে। খুব প্রয়োজন না হলে দরোজাটি মিনুরা ব্যবহার করে না। বাইরের গেস্ট এলে আর তখন যদি মিনুর স্বামী আনিস বাড়ি থাকে তখন কখন কখন খোলা হয়। মিনু একা থাকলে ওই দরোজা খোলার আজকাল প্রশ্নই ওঠে না।

তবে সকাল থেকে সন্ধে অব্দি তো বটেই এমন কী রাত দুপুরেও কতবার যে নক হয় ওই দরোজায়! থেকে থেকে ভিক্ষুক আসে। কত রকম কায়দায় যে দরোজা ধাক্কায়, ঘ্যান ঘ্যান করে! এই ফ্ল্যাটে আসার পর, প্রথম প্রথম দরোজা খুলে প্রায়ই ভিক্ষে দিত মিনু। কিন্তু এত ভিক্ষুক আসে, সামলানো মুশকিল।

দিনে দিনে ভিক্ষে দেয়া বন্ধ করেছে মিনু। এখন ভিক্ষুকরা দরোজা ধাক্কালে দরোজা খোলা তো দূরের কথা, ভেতর থেকে যে ভদ্রতা করে বলবে, মাফ কর, ওটুকু পর্যন্ত বলে না মিনু। ভিক্ষুকরা ভিক্ষুকদের মত দরোজা ধাক্কে ক্লান্ত হয়ে ফিরে যায়।

বাড়িঅলার স্ত্রী মিনুকে একদিন বলেছিল ভিক্ষুকদের উৎপাতের জন্যেই নাকি ফ্ল্যাটটির ভাড়া তিনশো টাকা কম। গ্রাউন্ড ফ্লোরে রাস্তার সঙ্গে ফ্ল্যাট, বারান্দা ব্যবহার করতে পারা না পারা নাকি আসলে কোন কারণ নয়।

শুনে মিনু বেশ অবাক হয়েছিল।

আজ দুপুরে মেয়েকে খাওয়াতে বসে বাড়িঅলার স্ত্রীর কথাটি মনে পড়ল মিনুর। কারণ বারান্দার

দিককার দরোজায় টুকটুক করে নক করছে কে! বেশ ভদ্র ধরনের মৃদু শব্দ। ভিক্ষুকরা সাধারণত এতটা ভদ্রতা করে না। কেউ কেউ তো এত জোরে ধাক্কায় যেন না খুললে দরোজা ভেঙেই ফেলবে।

অবশ্য নক করার সঙ্গে ডাকাডাকিও করে তারা। আমমা শ একমুঠ খরাত দেন আমমা।

কথা বলার ক্ষমতা না থাকলে, বোবা হলেও মুখ দিয়ে নানা রকম শব্দ করে। কিন্তু এখন যে নক করছে সে মুখ দিয়ে কোন শব্দ করছে না। মিনু একটু অবাকই হল। এ আবার কোন উৎপাত! বেশ নতুন ধরনের!

ডাইনিং টেবিলে বসে মমকে খাওয়াচ্ছিল মিনু। একটা প্লেটে সামান্য ভাত নিয়েছে আর মলা মাছের ঝোল। ভাতের ছোট ছোট ডেলা করে সাজিয়ে রেখেছে প্লেটে। মম একটা করে ডেলা মুখে নিচ্ছে, নিয়েই ছুটে চলে যাচ্ছে বেডরুম কিংবা ড্রয়িংরুমে। এটা করছে ওটা করছে। কিন্তু ভাতটা সহজে চিবোচ্ছে না, গিলছে না। মুখটা পেটকা মাছের পেটের মত ফুলে আছে।

এই সময় মিনু সাধারণত মমর পিছু পিছু থাকে। মম যেখানে যায় ভাতের প্লেট হাতে মিনুও যায় সেখানে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে মমর মুখের দিকে। কখন মুখের ভাতটা গিলবে মম! সঙ্গে সঙ্গে আরেক ডেলা ভাত ঠেলে দেবে মমর মুখে। মম না খেতে চাইলে রাগ করবে, ধমক দেবে, ভয় দেখাবে। এসব করার পরও আধঘন্টার মত সময় মমকে ভাত খাওয়াতে লাগবেই।

আজ মমর পিছু পিছু ছোটার শক্তি ছিল না মিনুর। সকাল থেকেই কী রকম ক্লান্ত লাগছে! লাগবে না কেন, ভোর ছটার দিকে ঘুম ভেঙেছে তারপর থেকে একটানা কাজ। মমকে বাথরুম করিয়ে হাত মুখ ধুইয়ে বসিয়ে দিয়েছে আনিসের কাছে। তারপর নিজে হাত মুখ ধুয়ে কিচেনে ঢুকেছে। নিজেদের জন্যে চা করেছে, মমর জন্যে করেছে দুধ। আগের সন্ধেয় আনা পাউরুটি থাকে ঘরে। সকালবেলা ঘুম ভাঙার পর চা আর পাউরুটি খায় মিনু আনিস। মম খায় পাউরুটি আর দুধ। তারপর নটার দিকে গরম ভাত খেয়ে অফিসে যায় আনিস। একটা ছুটা বুয়া আছে। দুবেলা এসে কাজ করে দিয়ে যায়। বুয়াটা আজ আসেনি। বোধহয় শরীর খারাপ হয়েছে। এজন্যে সকাল থেকে একা সংসারের যাবতীয় কাজ করতে হয়েছে মিনুকে। এখন মেয়েকে খাওয়াতে বসে হাত পা একেবারে ভেঙে আসছে মিনুর। নড়াচড়া করতে ইচ্ছে করছে না। সংসারের জন্যে আসলে বাঁধা একজন কাজের মানুষ দরকার। সংসার যত ছোটই হোক কাজ কী কম! একা এত কাজ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু মমটা গেল কোথায়! ভাত খেতে আজ তো দেখি আরও সময় নিচ্ছে!

মিনু বেশ বিরক্ত হল। তীক্ষ্ণ গলায় ডাকল, মম।

ভাত মুখে থাকলে মম কখন সাড়া দেয় না। ডাকলে ছুটে আসে।

এখন এল না। ড্রয়িংরুম থেকে সাড়া দিল। জ্বী আম্মু।

কোথায় তুমি?

এই তো।

এখানে এস। ভাত নাও।

না আম্মু।

কেন?

আর খাব না।

কী বলছ! অর্ধেকও তো খাওনি!

তাহলে তুমি এখানে এস।

আমি আসতে পারব না। আমার ভাল লাগছে না।

কিন্তু আমি যে খেলছি!

www.shoponil.com

এখন খেলতে হবে না। এস।
ঠিক তখুনি দরোজায় আবার সে রকম মৃদু নক।
মম বলল, আন্টু তোমাকে ডাকছে।
মিনু অবাক হল। কে ডাকছে?
মম খিলখিল করে হেসে উঠল। জানি না।
এই সময়টা বাড়িতে আর কোন লোক থাকে না বলে মেয়ের সঙ্গে টুকটাক নানা রকমের কথা বলে মিনু। হাসে, মজা করে। যেন তার বয়সও মমর মত। দুটো শিশু যেন অবোধ ভাষায় কথা বলে। ফলে এই সময় মম সাধারণত মিনুর কোন শাসন মানে না। কত যে কথা বলে! অকারণে হাসে। মজা করে।
দরোজায় শব্দ শুনে এখনও তেমন মজা করছিল মম। কিন্তু মিনু কী বুঝল কে জানে, ক্লান্তি ঝেড়ে ড্রয়িংরুমে গেল সে। তখনও টুকটুক করে নক হচ্ছে দরোজায়। মমর মুখে এক ডেলা ভাত গুজে দিয়ে মিনু হঠাৎ করে বলল, কে?
বারান্দা থেকে শিশু কণ্ঠে সাড়া দিল কেউ। আমি।
আমি কে?
আমারে আপনে চিনবেন না।
কী চাই?
কামের মানুষ রাখবেন?
কথাটা শুনে বেশ অবাক হল মিনু। এভাবে কাজ খুঁজতে আসে নাকি কেউ! আজকের আগে কখনও তো কেউ এমন করে আসেনি! গলা শুনে মনে হচ্ছে অল্প বয়সী বাচ্চা মেয়ে। বাঁধা কাজের লোক মিনুর একজন দরকার। অল্প বয়সী হলেই বা অসুবিধা কী! শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে অল্প বয়সীরা বড়োদের তুলনায় বেশি কাজ করে, ভাল কাজ করে। টাকা পয়সাও দিতে হয় কম। কখনও কখনও দিতেও হয় না। শুধু তিনবেলা খাওয়া, থাকা। আর বছরের দু ঈদে দুটো জামা।
এসব ভেবে মিনু বেশ উত্তেজিত হল। দরোজা খুলতে চাইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার থেমেও গেল। ঢাকায় আজকাল নানা রকমভাবে চুরি ডাকাতি ছিনতাই রাহাজানি হচ্ছে। চোর ডাকাতরা অদ্ভুত সব পদ্ধতি বের করছে। দিনের এই সময়টায় পুরুষমানুষরা সাধারণত বাড়ি থাকে না। ছেলেমেয়েরা থাকে স্কুল কলেজে। বাড়িতে থাকে শুধু মহিলারা। এই সময় নানা রকম অছিলায় বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে তারা। এই বাচ্চা মেয়েটিকে ঘিরে তেমন কোন একটি চক্র কাজ করছে না তো! বাচ্চা মেয়েটিকে দিয়ে অনুনয় বিনয় করিয়ে, কাজের মানুষ রাখার কথা বলে বাইরের দিককার দরোজা যদি একবার খোলাতে পারে, দরোজা খুলে মিনু হয়ত দেখবে বাচ্চা মেয়েটির সঙ্গে দু তিনজন তাগড়া জোয়ান লোক দাঁড়িয়ে আছে, মিনু দরোজা খুলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিনুকে ধাক্কা মেরে ভেতরে ঢুকে যাবে তারা, ছুরি কিংবা রিভলবার ঠেকিয়ে
এই অব্দি ভেবে ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল মিনুর। বুকের ভেতর ধুকপুক ধুকপুক করতে লাগল। শুকনো গলায় মিনু বলল, না আমাদের কাজের লোক লাগবে না। যাও।
মিনুর কথা শুনে মেয়েটি কিন্তু দমল না। বলল, আমি তো হুনলাম কামের মানুষ আপনেগ লাগব।
মিনু অবাক হল। কে বলল? কার কাছে শুনলে?
আপনেগ বাড়ির বুয়ায় কইল।
আমাদের বুয়াকে তুমি চেন?
হ চিনি।
মেয়েটিকে পরীক্ষা করার জন্য মিনু বলল, বুয়ার নাম কী বল তো?
মেয়েটির মুখ না দেখেও মিনু বুঝতে পাল সে বেশ থতমত খেয়েছে। তবে চটপটে মেয়ে। দমল না সে। বলল, বুয়ার নাম জানি না। হের পোলার নাম জানি। রমজান। রমজান ভাইর মা।

রেললাইনের বস্তিতে থাকে। আমরাও হেই বস্তিতে থাকি। রমজান ভাইর মার খুব জ্বর। হের লেইগা আইজ কামে আহে নাই। আমারে পাডাইয়া দিল।
মেয়েটির কথা শুনে মিনু বুঝে গেল সত্যি সত্যি বুয়া তাকে পাঠিয়েছে। কথা যা বলল সবই সত্য। শুধু বুয়ার জ্বরের ব্যাপারটি মিনুর জানা ছিল না, জানল।
তবু দরোজা খুলল না মিনু। ভাবল হয়ত সব খোঁজ খবর নিয়েই, চুরি ডাকাতি করার আটঘাট বেঁধেই যারা আসার এসেছে। দরোজা খুলেই মিনু দেখতে পাবে বাচ্চা মেয়েটির পেছনে কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে তাগড়া জোয়ান ভয়ংকর চেহারার দু'তিনজন মানুষ।
মিনু বলল, রমজানের মা ভাল হলে তার সঙ্গে এস। এখন যাও। আমি এভাবে লোক রাখব না।
এবার মেয়েটি বেশ হতাশ হল। মন খারাপ করা গলায় বলল, হের বহুত জ্বর। কবে ভালা অইব কে জানে!
যখন ভাল হয় তখন এস।
মেয়েটি কথা বলল না। মিনু বুঝতে পারল সে চলে যায়নি। কী ভেবে বলল, ওদিক দিয়ে ঘুরে ভেতর বাড়িতে এস। গেট দিয়ে ঢুকবে। ঢুকে দাঁড়াও। আমি আসছি।
মেয়েটি প্রচন্ড উৎসাহের গলায় বলল, আইচ্ছা।
মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে মমকে বেশ কয়েক ডেলা ভাত খাইয়েছে মিনু। আর দুটো মাত্র ডেলা আছে। মমর দিকে তাকিয়ে মিনু বলল, তাড়াতাড়ি খাও মম। আমার কাজ আছে।

মেয়েটির বয়স আট ন বছরের বেশি হবে না। বেশ রোগা পটকা শরীর। গায়ের রঙ ময়লা। মাথায় এক বোঝা নোংরা চুল এমন উসকো খুসকো, দেখলে সত্যি সত্যি পাখির বাসা মনে হয়। পরনে হাঁটু অব্দি লম্বা গাউনের ঝিলঝিলে জামা। কী যে ময়লা জামাটি! হাত পা খড়ি ওঠা। কিন্তু মুখটি অদ্ভুত মায়াবি। বেশ মিষ্টি ধরনের। চোখ দুটো টানা টানা। মুখের দিকে তাকালে কী রকম মায়া লাগে!
মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে মিনুর মনে হল এই মুখে কোন চালাকি নেই।
যদিও নিজের ফ্ল্যাট তালা মেরে, মমকে কোলে নিয়ে বাড়ির ভেতর দিক দিয়ে গেটের সামনে এসেছে মিনু, মানে সাবধান যতটা হওয়ার হয়েই এসেছে, মেয়েটির মুখ দেখে এতটা সাবধান হওয়ার ব্যাপারটি তার কাছে অকারণ মনে হল।
মেয়েটি তখন কী রকম চোখ করে তাকিয়ে আছে মিনুর দিকে।
মিনু বলল, নাম কী তোর?
মেয়েটি ম্লান হাসল। সোনা।
আগে কোথাও কাজ করেছিস?
না। তয় বেবাক কাম করতে পারুম। রাইখা দেখেন যা কইবেন তাই করতে পারুম।
মিনু হেসে ফেলল। না পারলে?
দুয়েকদিন রাইখা দেখেন, না পারলে খেদাইয়া দিয়েন।
সোনার কথা শুনে মনটা কী রকম করে উঠল মিনুর। বলল, আগে কোথাও কাজ করিসনি কেন?
আগে তো মায়ই কাম করত। আমি আর আমার ভাইয়ে ঘরে থাকতাম। মায় ছুড়া কাম কইরা নিজের খাওন পাইত, আমাগ দুই ভাই বইনের খাওন পাইত। পয়সাও পাইত।
তোর মা এখন কাজ করে না?
সোনার মুখ বিষন্ন হয়ে গেল। আমার মায় মইরা গেছে।
কথাটা শুনে মিনু বেশ থতমত খেল। এ্যাঁ!

www.shopnil.com

হ। আইজ বারোদিন অইছে মায় মরছে।
কী হয়েছিল?
অসুখ। বস্তির মাইনষে হাসপাতালে দিয়াইছিল। সাত আট দিন হাসপাতালে আছিল! তারবাদে মইরা গেছে। খবর পাইয়া আমি আর আমার ভাইয়ে গেছিলাম। বস্তির মাইনষেরে এত কইলাম, এত আতে পায়ে ধরলাম, আমার মারে আইন্না শরস্তানে কবর দেও, কেউ আমাগ কতা হুনল না। পরে হাসপাতালের গাড়ি কইরা কই জানি লইয়া গেল মার লাশ।
তোর ভাই কত বড়?
বেশি বড় না। আমার সমানই।
তোর সমান মানে?
হ আমরা জমক ভাই বোন।
জমক মানে যে যমজ কথাটা বুঝতে পারল মিনু। বেশ অবাক হল সে। যমজ ভাইবোন খুব কম দেখা যায়। হয় যমজ বোন হয় নয় যমজ ভাই। এক রকম চেহারা হয় দেখতে।
মিনু বলল, তোর বাবা নেই?
না।
মারা গেছে?
না। বাবায় কই জানি আর একটা বিয়া করছে। অহন আমাগ চিনে না। আমরাও বাবারে চিনি না।
এদের জীবনের গল্প এরকমই হয়। মিনু জানে। তবু বলল, তোর বাবা তোদের কোন খোঁজ খবর নেয় না?
না।
তোর ভাই কী করে?
অহনতরি কিছু করে না। আইজ থিকা করব।
কী করবে?
কইতে পারি না। আমি আইজ কাম বিচরাইতে বাইর অইছি, আমার ভাইয়েও বাইর অইছে। রমজান ভাইর মায় আমারে আপনের কাছে আইতে কইছে।
সোনার মুখের দিকে তাকিয়ে কী ভাবল মিনু। তারপর বলল, তোকে রাখলে কিন্তু ওই বুয়াকে আমরা আর রাখব না।
সোনা অতি উৎসাহের গলায় বলল, রাখন লাগব না। বুয়ায় তো আর কামে আইব না। হের অসুখ।
অসুখ ভাল হলেও আসবে না?
না। এর লেইগাই তো আমারে পাডাইল।
তাহলে তোর কিন্তু সব কাজ একা করতে হবে। সব সময় থাকতে হবে। টাকা পয়সা পাবি না। খাওয়া থাকা জামা কাপড় এসব পাবি।
আইচ্ছা।
রাতে ঘুমোবি আমাদের ডাইনিং স্পেসে।
সোনা অবাক হল। ক্যান?
তাহলে কোথায় ঘুমোবি?
আমি আমার ভাইয়ের কাছে ঘুমামু। আমি আমার ভাইরে ছাড়া থাকতে পারুম না।
কিন্তু তোর ভাইকে তো আমরা আমাদের বাসায় রাখব না।
ভাইরে রাকতে অইব না। আমি রাইতে বস্তিতে গিয়া ভাইর কাছে থাকুম।
তাহলে কী করে হবে।
কাম। বিয়ানে, আয়জানের লগে লগে কামে আইয়া পরুম, রাইতে বেবাক কাম শেষ কইরা

ঘুমানের আগে বস্তিতে যামুগা।
মিনু বিরক্ত হল। এই তো আরেক ঝামেলা বাঁধালি।
সোনা দুঃখি মুখ করে বলল, কী করুম কন, মায় মইরা যাওনের পর আমি যে আমার ভাইরে ছাড়া ঘুমাইতে পারি না।
মিনুর কোলে এই এতক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে ছিল মম। বসে অবাক চোখে সোনাকে দেখছিল। হঠাৎ করে বলল, তোমার ভাইয়ার নাম কী?
মম কথা বলে খুব মিষ্টি করে। অচেনা যে কেউ মমর কথা শুনলে মুগ্ধ হয়ে তার মুখের দিকে তাকাবে। সোনাও তাকাল। শিশুদের কথায় শিশুরা খুব আনন্দিত হয়। সোনাও হল। উচ্ছল গলায় বলল, আমার ভাইয়ার নাম মানিক।
মম কথা বলার পর পরই মিনুর যেন হঠাৎ করে মমর কথা মনে পড়েছিল। চার বছরের মেয়েকে এই এতক্ষণ ধরে কোলে রেখেছে সে। এমনিতেই সকাল থেকে ক্লান্ত হয়ে আছে। তার ওপর এতক্ষণ ধরে মম তার কোলে!
অনেকটা ছটফটে ভঙ্গিতে মমকে কোল থেকে নামিয়ে দিল মিনু। নাম মা। এত বড় মেয়ে এতক্ষণ কোলে থাকে না।
সঙ্গে সঙ্গে মমর দিকে হাত বাড়াল সোনা। আস আমার কুলে আস।
মম মিষ্টি করে হাসল। তুমি তো ছোট্ট মেয়ে! তুমি আমাকে কোলে নিতে পারবে?
হ পারুম।
নাও তো দেখি।
সোনা বেশ বড়দের মত করে কোলে নিল মমকে। পারছি না?
সোনার কোলে মম তখন আনন্দে দোল খাচ্ছে। হাসছে। মিনুকে বলল, দেখেছ আম্মু, আমাকে কোলে নিয়েছে।
মিনু কী রকম চোখে সোনার দিকে খানিক তাকিয়ে রইল। তারপর মুহূর্তেই যেন এই এতক্ষণ ধরে সোনার সঙ্গে নানা রকমের কথা বলা, শুরু থেকে সন্দেহ, ভয় সব ভুলে গেল। যেন আপন আত্মীয়কে ডাকছে এমন স্বরে বলল, চল ঘরে চল।
মমকে কোলে নিয়ে মিনুর পিছু পিছু হাঁটতে লাগল সোনা।

চায়ে চুমুক দিয়ে আনিস বলল, এতটুকু পুঁচকে মেয়ে দিয়ে সংসার চালাবে!
মিনু কুট করে টোস্ট বিস্কুটে কামড় দিল। পুঁচকে হলে কী হবে, কাজের আছে।
কী করে বুঝলে!
মিনুর স্বভাব হচ্ছে এক কামড় বিস্কুট মুখে দেয় আর এক চুমুক চা। এখনও তাই করল। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, দুপুর থেকে আছে। এখন সন্ধে। এই এতক্ষণ ধরে নানা রকম কাজ দিয়ে পরীক্ষা করলাম। বেশ ভাল কাজ করে। বেশ চটপটে। কাজে একদমই ফাঁকি দেয় না।
অফিস থেকে ফিরে, জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে ডাইনিং টেবিলে বিকেলের চা খেতে বসেছে আনিস। আনিসের স্বভাব হচ্ছে হুমহাম করে দ্রুত খাওয়া শেষ করা। খেতে বসে সময় নষ্ট সে একদম পছন্দ করে না। খাওয়াটা নিতান্ত প্রয়োজনেই খায়, আরাম আয়েস করার জন্যে নয়।
কিন্তু মিনু হচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টো। আস্তে ধীরে বেশ আয়েশ করে সময় নিয়ে খায়। এখনও নিজস্ব ভঙ্গিতেই খাচ্ছিল মিনু। এক কামড় বিস্কুট খাচ্ছে এক চুমুক চা। অন্যদিকে আনিস তার খাওয়া শেষ করে সিগ্রেট ধরিয়েছে।
সিগ্রেটে টান দিয়ে আনিস বলল, প্রথম দিন বলেই হয়ত এতটা সিনসিয়ার। দু'চারদিন গেলেই

www.shopnil.com

দেখবে ফাঁকি দিতে শুরু করেছে।
আমার মনে হয় না সোনা তেমন করবে।
সোনা নাকি নাম!
হ্যাঁ।
অমন করবে না কেন মনে হচ্ছে তোমার?
মেয়েটি আগে কোথাও কাজ করেনি। অন্য কোথাও কাজ টাজ করে এলে চালাক চতুর হত। ফাঁকিবাজ হত।
আনিস আবার সিগ্রেটে টান দিল। তা ঠিক।
সবচে বড় কথা তোমার মেয়ে অসম্ভব পছন্দ করেছে সোনাকে। সোনা আছে বলে দুপুরবেলা সে ঘুমোল না। সোনার সঙ্গে হাসছে খেলছে ছুটোছুটি করছে। বার বার সোনাকে বলছে, সোনা তুমি কিন্তু চলে যাবে না। আমি তাহলে কাঁদব।
এর অবশ্য কারণ আছে। একা একা থাকে তো! সঙ্গী নেই।
কথাটা বলে কী রকম চোখে মিনুর দিকে তাকাল আনিস। রহস্যময় মৃদু একটা হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। হাসির মানেটা মিনু বুঝল। সরাসরি বলল, তুমি যত যাই বল আপাতত দ্বিতীয় বাচ্চাটি আমি নেব না। এমনও হতে পারে আর কোনও দিনই বাচ্চা নেব না। একটিই যথেষ্ট। একটিকে সুন্দর করে মানুষ করতে পারলেই হবে।
আরে না, একটা ছেলে থাকবে না আমাদের।
আজকালকার দিনে ছেলে বা মেয়ে কোন ব্যাপার নয়। বাচ্চা একটা দরকার একটা আমাদের আছে। আর পুরনো দিনের মানুষদের মত ছেলে ছেলে কর কেন তুমি! ছেলে থাকলে কী এমন স্বর্গ জয় করে দেবে তোমাকে! তুমি বুড় হলে ছেলে তোমাকে রোজগার করে খাওয়াবে এই সব পুরনো আইডিয়া বাদ দাও। সামনে যে সময় আসছে কেউ কারু দিকে ফিরে তাকাবে না। বরং মেয়ে থাকা ভাল। বিয়ে ফিয়ে দিয়ে দেব ঝামেলা শেষ।
আনিস দীর্ঘশ্বাস ফেলার মত শব্দ করে সিগ্রেটে টান দিল। কিন্তু একটা ছেলের বড় সখ আমার।
মিনু চায়ে শেষ চুমুক দিল। তারপর হাসল। আমি তোমাকে একটা গল্প বলি। আমাদের দিনাজপুর শহরের গল্প। আসলে গল্প নয়, সত্য ঘটনা। ছেলে হওয়ার আশায় প্রতি বছর এটেম্পট নেয় এক লোক। আর প্রতি বছরই মেয়ে হয় ন। বছরে নটি মেয়ে হয়ে গেল। বউটি ছিল অতিশয় ভাল এবং স্বামীঅন্তপ্রাণ। স্বামীকে খুশি করার জন্য, ছেলে উপহার দেয়ার আশায় প্রতি বছরই গর্ভবতী হত সে। কিন্তু ছেলে আর হয়নি। এখন অতগুলো মেয়ে নিয়ে কী যে কষ্ট তাদের। না বিয়ে দিতে পারে না ঠিকঠাক মত খাওয়াতে পরাতে পারে।
আমি কিন্তু ওই অদ্রমহিলার মত নই। স্বামীর প্রতি ভালবাসা ইত্যাদি কারু চে কম নেই আমার। কিন্তু আমি একটু প্রাকটিক্যাল ধরনের মেয়ে। ভবিষ্যৎ না ভেবে কোন কাজ আমি করি না। আর একটি বাচ্চা নিয়ে মানে ছেলের আশায় তুমি যদি আমার সঙ্গে কোন রকমের বাড়াবাড়ি কর আমি শপনে লাইগেশান করিয়ে ফেলব। তুমি টেরও পাবে না।
সিগ্রেটে শেষ টান দিয়ে তলানী পড়ে থাকা চায়ের কাপে ফেলে দিল আনিস। দেখে রেগে গেল মিনু। এই কী অসভ্যতা! আমাকে বলতে। এসট্রে এনে দিতাম।
আনিস হাসল। এতক্ষণ দাওনি কেন! এতক্ষণ ধরে তো এই কাপেই ছাই ঝেড়ে গেলাম।
তাই নাকি! আমি খেয়াল করিনি তো!
আনিস কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই মম ছুটে এল। পাপা শোন, সোনা না খুব সুন্দর গল্প বলে!
আদর করে মেয়ের গাল টিপে দিল আনিস। তাই!
হ্যাঁ।
মিনু বলল, যাও সোনার কাছে গল্প শুন গিয়ে।

আচ্ছা।
মম ছুটে ড্রয়িংরুমে চলে গেল।
মিনু বলল, কাল তো শুক্রবার, তোমার অফিস নেই সোনার সঙ্গে তুমি একটু ওদের বস্তিতে যাবে।
আনিস খুবই অবাক হল। কেন?
সোনার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে তো কোন কথাই বলা হল না। মেয়েটির ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে হবে না! সে যা যা বলেছে ঠিক বলেছে কী না জানতে হবে না! আন্দাজে ওকে রাখা তো ঠিক হবে না।
কিন্তু আন্দাজেই তো রেখে বসে আছ।
খুব একটা আন্দাজে রাখিনি। সোনাকে তো আসলে পাঠিয়েছে আমাদের বুয়া। বুয়ার নাকি অসুখ। সে আর কাজে আসবে না। একই বস্তিতে থাকে ওরা। সোনার মা বাবা কেউ নেই। বাবা অনেককাল আগে কোথায় আর একটা বিয়ে করে ভেগেছে। মাটা বারদিন আগে হাসপাতালে মারা গেছে। এখন শুধু সোনার একটা ভাই আছে। জান সোনা আর ওর ভাইটি যমজ।
তাই নাকি।
হুঁ। তুমি কাল গিয়ে খোঁজ খবর নেবে সোনা যা যা বলেছে ঠিক বলেছে কিনা!
কাল না দু একদিন পরে যাব। কাল আমার একটু কাজ আছে।
তারপর একটু থেমে আনিস বলল, কিন্তু এইটুকু মেয়েকে দিয়ে কী করে সংসারের সব কাজ করাবে তুমি?
দেখো কী করে করাই। আসলে এইটুকু মেয়ে দিয়েই সংসার চালাতে সুবিধে। যখন তখন দোকানে পাঠাতে পারবে, বাজারে পাঠাতে পারবে। মশলা বাটা, কাপড় ধোয়া, হাড়িপাতিল মাজা থেকে শুরু করে মমর সঙ্গে খেলা করা পর্যন্ত সবই এই বয়সী মেয়েকে দিয়ে সম্ভব। তার ওপর কোন মাইনে দিতে হবে না। শুধু খাওয়া আর দু ঈদে দুটো জামা। ভোরবেলা আজানের সঙ্গে সঙ্গে কাজে আসবে রাতের বেলা।
ঘুমোবার আগে চলে যাবে।
আনিস অবাক হল। কোথায় যাবে?
বস্তিতে।
তুমি না বললে মা বাবা কেউ নেই।
তা নেই। কিন্তু ভাইটি তো আছে। সোনা বলল সে নাকি ওর ভাইকে ছাড়া ঘুমোতে পারে না। যমজ ভাই বোন বলে ওদের বোধহয় টানটা একটু বেশি।
আনিস কোন কথা বলল না।

রেল লাইনটা অকেজো হয়েছে বেশ অনেকদিন। রেল চলে না। লাইনটা বন্ধ হয়ে গেছে। মানে সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। শনা যাচ্ছে রেলওয়ের লোক এসে লাইনটা আস্তে ধীরে তুলে নিয়ে যাবে। রেল লাইনের জায়গায় পাকা রাস্তা হবে।
কিন্তু কোথায় কী! কথা তো শনা যাচ্ছে অনেক কাল ধরে। মানিক তো তার জন্মের পর থেকেই শুনে আসছে। তখন বস্তিটা মাত্র তৈরি হচ্ছে। রেল লাইনের দু'পাশের ফাঁকা জায়গায় একটু দুটো করে ঝুপড়ি উঠছে। রাস্তা ঘাটে পড়ে থাকে ফুটপাতের দীনজনেরা রোদ বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে, পরিবার পরিজন নিয়ে একই জায়গায় মাথা গুজে পড়ে থাকার আশায় যেখানে যা পাচ্ছে জড়ো করে ঝুপড়ি তুলছে।
মা যে কোথায় খবর পেয়েছিল। মানিকের মনে আছে শীত মাত্র পড়ে আসছে এমন এক সময়

www.shopnil.com

সোনা এবং মানিককে নিয়ে, মাথায় কাথা কাপড়ের বোছকা বুচকি, এখানে চলে এল মা। তার আগে কোথায় থাকত তারা সে কথা মনে পড়ে না মানিকের। এখানে এসে প্রথম কয়েক দিন কাথা কাপড় জড়িয়ে খোলা আকাশের তলায় পড়ে থাকত তিনজন মানুষ। তারপর আস্তে ধীরে নিজেদের একটা ঝুপড়ি উঠে গেল। নিজের ঘর হল মার। কিন্তু সেই ঘর ফেলে কোথায় চলে গেছে মা! মরে গেলে মানুষ আর কখনও ফিরে আসে না। মাও আর কখনও ফিরে আসবে না। এই জীবনে মার মায়াবি মুখটি আর কখনও দেখা হবে না মানিকের। কাজ থেকে ফিরে পাগলের মত আর কখনও মা তার ছেলেমেয়ে দুটোকে খুঁজবে না। কই আমার সোনা মানিক কই! দেক তগ লেইগা কী আনছি।

যে বাড়িতে কাজ করত মা, রাতের বেলা ফেরার সময় সেই বাড়ি থেকে, বাড়ির ছেলেমেয়েদের নষ্ট করা খাবার এলুমিনিয়ামের গামলায় করে নিয়ে আসত।

সেই গামলাটা এখন মানিকের পায়ের কাছে পড়ে আছে। গামলায় কিছু চাল, কয়েকটি শলআলু, দু'তিনটে বেগুন। খানিক আগে এসব নিয়ে বস্তিতে ফিরেছে মানিক। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। ভেবেছে ফিরেই সোনার হাতে দেবে জিনিসগুলো চটপট ভাত রাঁধতে বলবে। ভাতের সঙ্গে সেদ্ধ দেবে আলু। ঘরে কাঁচা মরিচ লবণ তেল আছে। আলু ভর্তা বানাতে অসুবিধা হবে না। গরম ভাত আর আলুভর্তা খেতে খুব স্বাদ হবে। দু'ভাই বোন পেট পুরে খাবে।

কিন্তু সোনা নেই। কোথায় গেছে কে জানে! খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে মানিকের। সোনার ওপর মেজাজ ভারি খারাপ হচ্ছে। সারাদিনে সাত টাকা রোজগার করেছে মানিক। এই টাকা থেকে ইচ্ছে করলে পেট পুড়ে খেতে পারত। দুটো পরোটা আর সামান্য তরকারি। সোনার জন্যেই তো খাওয়া হয়নি। সোনাকে না খাইয়ে রেখে নিজে খাবে একথা মানিক ভাবতেই পারে না।

কিন্তু সোনা গেছে কোথায়! রমজান ভাইর মাকে গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করবে! অনেক রাত হয়েছে। রমজান ভাইর মা কী এখনও জেগে আছে! তার অসুখ। যদি ঘুমিয়ে পড়ে থাকে ডাকলে রেগে যাবে।

মানিক এখন কী করে!

সকালবেলা মানিক যখন কাজের খোঁজে বেরুচ্ছে সোনা অবশ্য বলেছিল সেও কাজ খুঁজতে যাবে। যদি কোন বাসা বাড়িতে কাজ পাওয়া যায়।

সোনা কী তাহলে সত্যি সত্যি কাজ খুঁজতে গেছে। কাজ কী পেয়েও গেছে কোথাও! যে বাড়িতে কাজ পেয়েছে সেই বাড়িতেই কী থাকতে হবে তাকে! মানিক তাহলে এ ঘরে থাকবে কেমন করে! সোনাকে ছেড়ে একটি রাতও তো সে কখনও থাকেনি! আগে ছিল তিনজন মানুষ। মা সে আর সোনা। মা শুতো মাঝখানে দু'পাশে তারা দু'জন। দু'পাশ থেকে মার গলা জড়িয়ে ধরে, মার গায়ের ওপর পা তুলে কী যে সুখে ঘুমোত। তাদের দু'জনকে দু'পাশে শুইয়ে রেখে, গভীর ঘুমে ডুবিয়ে রেখে কোন ফাঁকে উঠে, চুপিসারে কোথায় যে চলে গেল মা! ঘুমঘোরে মার ফাঁকা জায়গায় চলে এল সোনা মানিক। নিজেদের অজান্তে একজন আঁকড়ে ধরল আরেক জনকে। এখন সোনাও যদি মানিককে ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকে, একা ঘরে মানিক তাহলে ঘুমোবে কী করে! ঘুমঘোরে আঁকড়ে ধরবে কাকে! এসব ভেবে খিদের কথা ভুলে গেল মানিক। কী এক কষ্টে বুক ফেটে যেতে চাইল তার। চোখ ফেটে যেতে চাইল। হাঁটুতে মাথা গুঁজে হু হু করে কাঁদতে লাগল মানিক। কুপির ম্লান আলোয় মানিককে মনে হতে লাগল পৃথিবীর সবচে দুঃখি বালক।

দূর থেকেই মানিককে দেখতে পেল সোনা। ঘরের সামনে কুপি জ্বালিয়ে হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে। মানিককে এভাবে বসে থাকতে দেখে মাথায় একটা বুদ্ধি এল সোনার। রেললাইন পেরিয়ে

পেরিয়ে পা টিপে টিপে মানিকের একেবারে পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। তারপর মানিকের কানের কাছে মুখ নিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে কু দিল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে মুখ তুলল মানিক। সোনা খিলখিল করে হেসে উঠতে গিয়ে থতমত খেয়ে থেমে গেল। চোখের জলে গাল ভিজে গেছে মানিকের। সোনা বিষণ্ন গলায় বলল, কানতাছচ ক্যা?

লুঙ্গির খুটে চোখ মুখ মুছল মানিক। তারপর সোনার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুই গেছিলি কই? এত রাইত অইয়া গেছে!

আমি তো কামে গেছিলাম।

কাম পাইছিচ? কই পাইলি?

রমজান ভাইর মায় যেই বাড়িতে কাম করত হেই বাড়িত। রমজান ভাইর মায়ই আমারে যাইতে কইছিল।

ম্যালা কতা কওনের পর রাকছে। পয়লা তো রাকতেই চায় নাই। চিনে না হোনে না রাখব ক্যা! রমজান ভাইর মার কতা কওনের পর রাকল। তাও সাবে বস্তিতে আইয়া দেইখা যাইব আমি যা যা কইছি ঠিক আছে নি।

তারপর হঠাৎই মানিকের পায়ের কাছে রাখা এলুমিনিয়ামের গামলাটা চোখে পড়ল সোনার। গামলায় রাখা চাল শলআলু আর বেগুন চোখে পড়ল। সোনা খুবই অবাক হল। এই হগল পাইলি কই?

কান্না অনেক আগে থেমেছে মানিকের। তবু একবার নাক টানল সে। কিন্না আনছি।

টেকা?

সাত টেকা কামাইছি।

কেমনে? কাম পাইছচ? কী কাম?

লোহার পোলে রিকশা ঠেইলা উপরে উডানের কাম। একটা কইরা রিকশা ঠেললে আটআনা। তয় আমার লাহান ম্যালা পোলাপানে ঠেলে তো, বেশি রিকশা পাওয়া যায় না। পয়লা দিন তো, বহুত খাটনি লাগল। এমুন খিলা লাগছে!

খাছ নাই কিছু?

না।

হারদিন না খাইয়া রইছচ?

হ।

ক্যা? পয়সা আছিল কিছু কিন্না খাতি।

তর লেইগা খাই নাই। মনে করলাম তুই না খাইয়া রইছচ। এর লেইগা চাইল আর আলু বাইগুন কিন্না লইয়াইলাম। আইয়া দেহি ঘর আন্ধার। তুই নাই।

আমি তো কাম পাইছি। দুইফরে ওই বাইতে খাইলাম। রাইতেও খাইয়াইলাম।

মানিক কথা বলল না। কী রকম মায়াবি চোখ তুলে সোনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সোনার তখন নিজেকে কী রকম অপরাধী লাগছে। আহা ভাইটি তার কথা ভেবে খায়নি আর সে ওদিকে দুপুরবেলা রাতেরবেলা অতগুলো করে ভাত অত সুন্দর তরকারি দিয়ে খেল। একবারও তো ভাইটির কথা মনে পড়েনি তার! ভাইটি তার খেয়েছে কী না একবারও তো ভাবেনি সোনা! কেন ভাবেনি।

মানিকের মুখের দিকে তাকিয়ে জলে চোখ ভরে এল সোনার। মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে সোনা বলল, ইট্টু সবুর কর ভাই আমি অহনই তরে ভাত রাইন্ধা দিতাছি। আলু ভর্তা বাগুন ভর্তা বানাইয়া দিতাছি।

সোনা চটপটে হাতে রান্নার আয়োজন করতে লাগল। দুপুর থেকে বস্তিতে ফেরার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত একটানা কাজ করে এসেছে সেই ক্লান্তি এখন আর টের পাচ্ছে না সোনা।

www.shopnil.com

অন্ধকার বিছানায় শুয়ে মানিক বলল, হেরা মানুষ কেমন?
সোনা মানিকের দিকে পাশ ফিরল। ভালই।
কয়জন মানুষ?
তিনজন। সাব বিবিসাব আর ছোট্ট একখান মাইয়া। ভাইরে মাইয়াডা যা সুন্দর! যা সুন্দর কইরা কতা কয়! আমারে বহুত পছন্দ করছে। হারাদিন আমার লগে খেলল। দুইফরে ঘুমাইল না।
নাম কী?
মম।
এইডা আবার কেমুন নাম অইল।
সাবগ পোলাপানের এমুন নাম ঐ অয়।
তরে হেরা মাইনা দিব?
না।
তাইলে?
তিনবেলার খাওন দিব। জামা কাপড় দিব। রাইতে থাকনের কতাও কইছিল। আমি রাজি অই নাই। কইছি আমি আমার ভাইরে ছাইরা থাকুম না।
মানিক কথা বলল না। বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার।
সোনা বলল, আমি বিয়ানে আজানের লগে লগে কামে যামু রাইতে ঘুমানের আগে আইয়া পরুম। বিবিসাবরে কইয়াইছি রাইতের খাওনডা খামু না। লইয়ামু। কাইল থিকা মার ওই ভোলডা লইয়া যামু।
ক্যা?
রাইতে একলা আমারে যেই ভাত খাইতে দিব হেই ভাত তুই আমি দুইজনে খাইতে পারুম।
ভাত তর আনন লাগব না।
সোনা বেশ অবাক হল। ক্যা?
রিকশা ঠেইলা ভালা পয়সা কামামু আমি। পোলের লগের ফুটপাতে বইয়া এক বেডায় ভাত বেচে। আড়াই তিন টেকার ভাত খাইলে পেড ভইরা যাইব। দুইফরে ওহেনে খামু রাইতেও খাইয়া আমু। পয়লা দিন দেইখা বেশি কামাইতে পারি নাই। কাইল থে দেকবি দশ এগের টেকা কামাইতাছি।
রাইতে ওহেনে খাওনের কাম কী! চাইল ডাইল কিনা লইয়াহিচ।
আমি আইয়া রাইন্দা দিমু।
না। হারাদিন কাম কইরা আইয়া আবার রাইতে রানতে ববি, কষ্ট অইব তর। এত কামের কাম নাই।
সোনা কথা বলল না। একটা হাত রাখল মানিকের গলায়।
মানিক বলল, তরে একখান কতা কই। রাইতে তুই আমারে কোনদিন ছাইড়া থাকিস না। তরে ছাইড়া একলা থাকলে ঘুম আইব না আমার। হেরা যুদি তরে রাইতে থাকতে কয় তাইলে তুই ওই কাম ছাইড়া দিবি। অন্য জাগায় কাম লবি। কাম না পাইলে করবি না। আমি যেই কয় টেকা কামামু হেতে দুই ভাই বইনের খাওন অইয়া যাইব।
ভাইয়ের বুকের কাছে চেপে এসে ঘুম ঘুম গলায় সোনা বলল, আইচ্ছা।

আনিস আজ অফিস থেকে ফিরল বেশ খানিকটা দেরি করে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অফিসের কাপড় ছাড়ছে, মিনু বলল, আজ যে অনেক দেরি করলে! কী ব্যাপার?
দাঁতে লুঙ্গি কামড়ে ধরে প্যান্ট ছাড়ল আনিস। তোমার জন্যে দেরি হয়েছে।
মিনু অবাক হল। আমার জন্যে মানে!
বস্তিতে যেতে বলেছিলে না!
হ্যাঁ। গিয়েছিলে?
গেলাম আরকি! তুমি বলেছ না গিয়ে পারি!
মিনু হাসল। অত আহলাদ দেখাবার দরকার নেই। সোনা যা যা বলেছে সব ঠিক আছে?
একদম ঠিক আছে।
তুমি কী রমজানের মার সঙ্গে কথা বলেছ?
রমজানের মার সঙ্গে বলেছি আরও কয়েকজনের সঙ্গে বলেছি।
কী বলল তারা?
বলল নিশ্চিন্তে রাখতে পারেন। চুরি ছ্যাচরামি করে পালাবে না।
মেয়েটি ভাল।
আনিসের কথা শুনে মিনু খুব খুশি হল। যাক নিশ্চিন্ত হলাম।
সোনাদের ঘরটাও দেখে এসেছি। চিনে এসেছি।
ওর ভাইটিকে দেখনি?
না।
কাপড় চোপড় ছাড়া হয়ে গেছে আনিসের। ডাইনিং টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসল সে। মুখটা হাসি হাসি করে বলল, তুমি যদি আদেশ কর তাহলে না হয় কাল আবার গিয়ে সোনার ভাইটিকেও দেখে আসব।
মিনু ভুরু কুঁচকে আনিসের দিকে তাকাল। আজ যে খুব ফূর্তি দেখছি! কী ব্যাপার?
ব্যাপার একটা আছে। চা খা দাও। বলছি।
আনিসের ফেরার আগেই চা বানিয়ে ফ্লাস্কে ভরে রাখে মিনু। ফ্লাস্কটা থাকে ডাইনিং টেবিলে আর একপাশে থাকে বিস্কুটের টিন। আনিস টেবিলে বসার সঙ্গে সঙ্গেই টিন খুলে বিস্কুট বের করে একটা পিরিচে রেখেছে মিনু। এখন পাশাপাশি দুটো কাপে চা ঢালতে লাগল।
তারপর যেন হঠাৎই খেয়াল হল মিনুর এমন ধরে বলল, কী ব্যাপার হাত মুখ ধুলে না?
আনিস বিস্কুটে কামড় দিল। ধুতে ইচ্ছে করছে না। খুব খিদে পেয়েছে। খেয়ে নিই।
মিনু হাসল। তারপর চেয়ার টেনে আনিসের মুখমুখি নিজের চায়ের কাপ নিয়ে বসল।
আনিস বলল, আমার কন্যাটি কোথায়?
মিনু বলল, ড্রয়িংরুমে।
কী করছে?
সোনার সঙ্গে খেলছে।
আমি অফিস থেকে ফিরলাম মেয়েটি একবারও আমার কাছে এল না। আগে তো ফেরার সঙ্গে সঙ্গে কোলে এসে চড়ত।
এখন সোনাকে পেয়ে গেছে।
তাই বলে বাপকে ভুলে যাবে।
মিনু খিলখিল করে হেসে উঠল। আনিস সঙ্গে সঙ্গে ডাকল, মম। ড্রয়িংরুম থেকে সাড়া দিল মম।
কেন পাপা?
আমার কাছে এস মা।
এখন আসতে পারব না পাপা। আমি খেলা করছি।
তবু একবার এস। তোমাকে একটু দেখি।

www.shopnil.com

আচ্ছা পাপা।
ছুটতে ছুটতে ডাইনিং স্পেসে এল মম। এসে আনিসের কোলের কাছে দাঁড়াল। দু'হাতে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে পিঠের কাছে মুখটা একটু ঘষে দিল আনিস। তারপরই সোনাকে দেখতে পেল। ড্রয়িংরুমের দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কী রকম চোখে তাকিয়ে আছে আনিসের দিকে! সোনাকে দেখতে আজ বেশ ভাল লাগছে।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চোখ মুখ ঝকঝক করছে। মাথার চুল ঝকঝক করছে।
আনিস তারপর তার মেয়ের দিকে তাকাল। ঠিক আছে মা যাও।
সোনার সঙ্গে খেলা কর গিয়ে।
সোনা বলল, আস মম।
মম ছুটতে ছুটতে চলে গেল।
চায়ে চুমুক দিয়ে আনিস বলল, তোমার কাজের মেয়েটি তো দেখি একেবারে ঝকমক ঝকমক করছে।
মিনু মৃদু হাসল। একটুকর সাবান দিয়ে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিয়েছি। বলেছি আধঘন্টা ধরে শরীরে মাথায় সাবান ঘষে শসল করবি। তারপর এই অবস্থা হয়েছে। মেয়েটির চেহারা টেহারা কিন্তু খারাপ নয়।
হ্যাঁ। আজ আরও ভাল লাগছে দেখতে।
এই মেয়েটিই যদি বস্তিতে না জন্মে স্বচ্ছ মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মাত কিংবা বড় লোকের ঘরে জন্মাত তাহলে তো ওকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত লোকে।
হ্যাঁ। পরিবেশ টাকা পয়সা এবং যত্ন মানুষকে সুন্দর করে।
আনিস আবার চায়ে চুমুক দিল ভেবে দেখ এই বয়সী একটি বাচ্চা পেটের দায়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করছে। যে বয়সে তার স্কুলে যাওয়ার কথা, হাসি আনন্দে নিজেদের ঘর সংসার মাতিয়ে রাখার কথা, মায়ের আদর বাবার স্নেহে বড় হয়ে ওঠার কথা সেই বয়সে দু'মুঠো ভাতের আশায় পথে নেমেছে। লোকের বাড়িতে কাজ করছে। আমরা স্বার্থপর মানুষ এইসব শিশুর শ্রমের ফায়দা লুটছি।
এত বড় বড় কথা বলছ কেন! আমাদের কী করার আছে! আমি না রাখলে অন্য কোথাও কাজে যেত। অন্য কেউ কাজে রাখত ওকে। কোথাও কাজ না পেলে পথে ঘাটে থাকত। ভিক্ষে করত দু'চার বছর পর যখন বালিকা হয়ে উঠত পুরুষমানুষরা সুযোগ নিতে শুরু করত। অন্য ধরনের নোংরা এক শ্রমে নিয়োজিত হত মেয়েটি। তারচে এ তো ভাল। সংসারের কাজ করে জীবন চালাচ্ছে। যে বাড়িতে কাজ করছে তাদের কেয়ারে থাকছে। খারাপ মেয়ে হয়ে যাচ্ছে না।
চা শেষ করে সিগ্রেট ধরাল আনিস। তা ঠিক। দোষটা আমাদের নয়। এইসব শ্রমজীবী শিশুদের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সচেতন হওয়া উচিত। পৃথিবীর কোন সভ্য শিক্ষিত দেশে শিশুদের এই ধরনের শ্রমের কথা লোকে ভাবতেই পারে না। পিতৃমাতৃহীন ছিন্নমূল শিশু যে ওসব দেশে নেই তা নয়। প্রচুর আছে। তবে তাদের জন্যে চমৎকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও আছে। হোস্টেল, পড়াশুনোর ব্যবস্থা, স্ট্যান্ডারড খাবার পোশাক চিকিৎসা। ওই সমস্ত শিশু দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না ওরা ছিন্নমূল।
মিনু বিরক্ত হয়ে বলল, বাদ দাও তো এসব। ভাল্লাগছে না। একটা কাজ কর, বিশ পঁচিশ টাকা গজের দু'গজ ছিট কাপড় এনে দিও। সোনাকে একটা জামা বানিয়ে দিতে হবে। আমি নিজেই সেলাই করে দেব। আর ফুটপাত থেকে দুটো সূতী প্যান্ট। মেয়েদের প্যান্ট। সব মিলে শখানেক টাকা লাগবে। সোনাকে তো আর মাইনে দিতে হচ্ছে না! কাপড় চোপড়টা দিতে হবে। মেয়েটার ওই একটা জামা একটা প্যান্ট। রোজ রোজ পরে। ভারি নোংরা হয়ে থাকে।
আনিস বড় করে সিগ্রেটে টান দিল। এনে দেবো।
তারপর একটু থেমে বলল, সুখবরটা শুনবে না?

কী?
আমি অফিসের কাজে এক সপ্তাহর জন্য দিনাজপুরে যাচ্ছি।
দিনাজপুর কথাটা যেন বুঝতে পারল না মিনু। উত্তেজিত গলায় বলল, কোথায়?
আনিস হাসল। দিনাজপুরে।
আমাদেরকেও নিয়ে যাও না! তুমি তোমার অফিসের কাজ করলে আর আমি সাতদিন আমাদের বাড়িতে বেড়ালাম।
এজন্যেই কথাটা বলেছি। ইচ্ছে করলে এক কাজে দুটো কাজ সেরে আসা যায়। তুমি তো বছর দুয়েক ধরে তোমাদের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছ না!
শুধু আমি কেন তুমিও তো শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছনা!
চল তাহলে যাই।
কবে যেতে হবে?
সোমবার বিকেলের মধ্যে অবশ্যই দিনাজপুর গিয়ে পৌঁছুতে হবে। মঙ্গলবার থেকে কাজ।
তার মানে সোমবার সকালে কোচে চড়তে হবে!
আমরা ইচ্ছে করলে একদিন আগেও যেতে পারি।
তাহলে তাই চল।
এদিকে কী ব্যবস্থা করবে?
এদিকে মানে?
বাসা! সোনা!
বাসা লক করে যাব। সোনাকে ছুটি দিয়ে দেব।
ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলে কেমন হয়?
কোন প্রয়োজন নেই। একজন মানুষের কোচ ভাড়া কম নয়।
তবু আমাদের সঙ্গে একটু বেরিয়ে এল! বাচ্চা মানুষ। এদের তো কোথাও বেড়ানো হয় না।
না।
এসে যদি দেখ অন্য কোথাও কাজে লেগে গেছে?
তা যাবে না।
কী করে বুঝলে?
তুমি কাল ওর কাপড়গুলো নিয়ে আসবে। ওগুলো দেখিয়ে বলব সাতদিন পর ফিরে এসে এগুলো তোকে দেব। ওই লোভে অন্য কোথাও কাজে লাগবে না।
আনিস হাসল। তাহলে আর কী! রেডি হও। রোববারেই যাবো।

গভীর রাতে সোনা মানিকদের বস্তি ঘরের ঝাপে ধাম করে কে লাথি মারল! ঝাপটা ভেতর থেকে আলগা করে লাগানো। লাথির চোটে উড়ে গিয়ে পড়ল সোনা আর মানিকের পায়ের কাছে। বেশ একটা শব্দ হল। সেই শব্দে ঘুম ভেঙে গেল দু'ভাই বোনের। ধরফর করে উঠে বসল তারা খানিকক্ষণ কিছুই বুঝতে পারল না। ভয়ে দু'জন দু'জনকে আঁকড়ে ধরল।
ঘরের ভেতর ছাপ ধরা অন্ধকার। ঘুম ভাঙা চোখে অন্ধকার সয়ে আসতেই খোলা দরোজার সামনে একজন মানুষ দেখতে পেল সোনা মানিক। যমদূতের মত দাঁড়িয়ে আছে।
মানিক বলল, কে ? আ কেডা?
মানুষটা গম্ভীর গলায় বলল, বাইরে আয় কইতাছি কেডা।
গলার আওয়াজটা খুবই চেনা চেনা। মানিক কথা বলবার আগেই সোনা বলল, রমজান ভাই!
সঙ্গে সঙ্গে ঠা ঠা করে হেসে উঠল লোকটি। রমজান ভাই! অত আল্লাদ কইরা ভাই ডাকন লাগব

www.shopnil.com

না। বাইর অ।
মানিক বলল, এত রাইতে কির লেইগা ডাকতাছ?
বাইর অ কই।
রমজানকে চিনতে পেরে ভয়টা কেটে গেছে দু'জনের। বুকের ধুক-পুকানি কমে গেছে। রমজান তাদের এই বস্তিরই লোক। এখানে আসার পর থেকেই রমজানকে দেখছে তারা। মা মারা যাওয়ার পর রমজানের মা ওদের দু'ভাই বোনকে বেশ সান্ত্বনা দিয়েছে। নিজে যে বাড়িতে কাজ করত সোনাকে কাজের জন্যে পাঠিয়েছিল সেই বাড়িতে। রমজানের মা বোধহয় আর কাজ করতে পারবে না। তার খুব অসুখ।
তখনও মানিকের হাত ধরে রেখেছে সোনা। মানিক তার হাত ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, তুই থাক। আমি দেহি কী কয়।
মানিকের কথাটা শুনতে পেল রমজান। ঝাঁঝালো গলায় বলল, না দুইজনেই বাইর অ।
দু'ভাই বোনের কেউ আর কথা বলল না। ঘর থেকে বেরুল।
রমজানের মুখমুখি দাঁড়িয়ে মানিক বলল, কী কও?
রমজান গম্ভীর গলায় বলল, কতা একটাই, এহেন থে যা গা।
কথাটা বুঝতে পারল না মানিক। অবাক হল। কই যামু গা?
এই বস্তি ছাইড়া যাবি গা। অক্ষনেই।
সোনা এগিয়ে এসে বলল, আমাগ ঘর ছাইড়া আমরা যামু ক্যা?
আইজ রাইত দুইফর থিকা এই ঘর আর তগ না। ঘর আমার। যা ভাগ। মার লেইগা এই কয়দিন তগ কিছু কইতে পারি নাই। নাইলে আরও আগেই তগ দুইজনরে ভাগাইয়া দিয়া ঘরডা দখল করতাম। আইজ হাসপাতালে দিয়াইছি মারে। দশা ভাল না। এই বস্তিতে আর ফিরা আইব না। কাইল নাইলে তার পরদিন মরব। মারে হাসপাতালে দিয়াই সোজা তগ ঘর দখল করতে আইলাম। ঘরডা আমার দরকার আমি বিয়া করুম। এই ঘরে বউ লইয়া থাকুম।
রমজানের হাতে যে বিড়ি ছিল এতক্ষণ বোঝা যায়নি। এখন বিড়িতে টান দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল। রমজানের মুখের সামনে জোনাকির মত এক বিন্দু আলো জ্বলে উঠল।
তখনও রমজানের এসব কথা মাথায় ঢুকছে না সোনা মানিকের। কথা শুনে কী রকম স্তব্ধ হয়ে গেছে দু'জন।
রমজান ধমকের স্বরে বলল, কী অইল খাড়াইয়া রইছচ ক্যা?
মানিক বলল, কই যামু?
কই যাবি হেইডা আমি জানি! যা ভাগ।
সোনা মানিকদের ঘরের দরোজায় দু'পা ছড়িয়ে বসল রমজান। বিড়ি টানতে লাগল। তার এই ভঙ্গি দেখে দু'ভাই বোন যেন এক সঙ্গে বুঝে গেল ব্যাপারটি প্রায় এক সঙ্গেই চিৎকার করে উঠল তারা। আমাগ ঘর আমরা কির লেইগা তোমারে দিমু। তুমি এই ঘরে থাকলে আমরা থাকুম কই! সরো, ঘরের সামনে থিকা সরো। নাইলে বস্তির বেবাক মানুষ ডাইকা উডাইয়া হালামু।
সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল রমজান। তারপর ধাম করে একটা লাথি মারল মানিককে। এমন আচমকা লাথি, মানিক একেবারে উড়ে গিয়ে পড়ল।
রমজান চিৎকার করে বলল, ডাক ওয়ারের বাচ্চা কারে ডাকবি। দেহি বস্তির কোন বাপে তগ বাঁচাইতে আহে।
তারপর সোনার ঘাড়ে এমন একটা ধাক্কা দিল, সোনা গিয়ে পড়ল মানিকের ওপর। পড়েই হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। ভয়ে হাত পা কাঁপতে শুরু করেছে তার।
বিড়ি টানতে টানতে রমজান এসে দাঁড়াল সামনে। যাবি না আরও লাথতি গুতা দিমু!
মানিক কিছু একটা বলতে যাবে, সোনা দু'হাতে তাকে আঁকড়ে ধরল। না না কতা কইছ না ভাই। কতা কইছ না। আমাগ হেয় মাইরা হালাইব। ল যাইগা।

www.shopnil.com

মানিক ফ্যাকাশে গলায় বলল, কই যামু? থাকুম কই?
সোনা কথা বলার আগেই রমজান বলল, আবার কতা।
তারপর লাথি মারার জন্য পা তুলল। সঙ্গে সঙ্গে মানিককে আড়াল করে দাঁড়াল সোনা। না না আর মাইর না, আমরা যাইতাছি গা। অহনই যাইতাছি গা।
মানিক বলল, ঘরে আমাগ কাথা কাপোড় আছে, লইয়া যামু?
রমজান ধমকের গলায় বলল, না। এই ঘরে আর ঢুকতেই পারবি না। ঘর তো আমারই। ঘরে যা যা আছে তাও আমার যা ভাগ।
দু'ভাই বোনের তখন বুক ফেটে যাচ্ছে। চোখ ফেটে যাচ্ছে। দু'জন দু'জনের কাঁধে হাত দিয়ে আস্তে ধীরে রেললাইনে ওঠে তারা। পেছন থেকে রমজান চিৎকার করে বলল, যদি কোনদিন এই বস্তিতে তগ দুইজনরে আর দেহি তাইলে আর লাথতি গুতা মারুম না। দুই পাও দিয়া দুইজনের গলা পাড়া দিয়া ধরুম। জান বাইর কইরা তারবাদে ছাড়ুম।
সোনা মানিকের তখন গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। বুক ভেসে যাচ্ছে। তাদের চোখের জল কেউ দেখে না।

মিনু বলল, কি রে কী হয়েছে? মুখ চোখ এত শুকনো কেন? মনে হয় খুব কেঁদেছিস।
সোনা বিষণ্ন গলায় বলল, রাইতে গুমাইতে পারি নাই।
কেন?
সোনার চোখ ছলছল করে উঠল। রাইত দুইফরে রমজান ভাইয়ে আমারে আর আমার ভাইরে ঘর থিকা বাইর কইরা দিছে।
কোন রমজান? যার মা আমাদের এখানে কাজ করত?
হ।
কেন বের করে দিল কেন?
ঘরডা ঝলে হের দরকার। হেয় বিয়া করব। বউ লইয়া থাকব।
ঘরটা রমজানের নাকি! তোরা ভাড়া থাকতি?
না আমাগ ঘর। বহুতদিন আগে আমার মায় ঘরডা বানাইছিল।
বস্তিতে তো যার যার নিজের ঘর বানাইয়া লইতে অয়।
তার মানে তোরা ছোট ছোট দুটি ভাই বোন বলে মা বাপ নেই বলে রমজান জোর করে তোদের ঘরটা দখল করল?
হ। আমরা গুমাইয়া রইছিলাম রমজান ভাইয়ে লাথথি দিয়া ঝাপ ভাইঙ্গা হালাইছে। তারবাদে আমাগ দুইজনরে ডাইকা বাইরে আনছে। আমার ভাইরে বহুত জোরে একটা লাথথি দিছে। আমারে ধাক্কা দিয়া ভাইর উপরে হালাইয়া দিছে।
কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল সোনা।
মিনু বলল, বস্তির লোক রমজানকে কিছু বলল না?
না কেঐ বাইর অয় নাই বস্তির বেবাক মাইনষে রমজানরে ডরায়।
রমজানের মায় নাকি তোদেরকে খুব আদর করে। তুই তো বললি সেই তোকে আমাদের এখানে কাজে পাঠিয়েছে। সে তার ছেলেকে কিছু বলল না।
রমজান ভাইর মায় তো হাসপাতালে। হের অবস্থা বহুত খারাপ। দুই একদিনের মইদ্যে বলে মইরা যাইব। হেরে হাসপাতালে দিয়াই রমজান ভাইয়ে আমাগ ঘর দখল করতে আইছে।
মিনু একটু আনমনা হল। তার মানে রমজানের মা না থাকলে ঘরটা তোদের আরও আগেই যেত!
সোনা কথা বলল না। দু'হাত দিয়ে ডলে ডলে চোখ মুছতে লাগল।

মিনু বলল, রাতে ছিলি কোথায়?
সোনা চোখ তুলে মিনুর দিকে তাকাল। শুনলে আপনে রাগ করব না তো!
মিনু অবাক হল। আমি রাগ করব কেন?
আপনেগ বারিন্দায় আছিলাম। বস্তি থিকা বাইর অইয়া আর কোনহানে যাওনের জাগা পাই নাই। আপনেগ বারিন্দায় আইয়া হারা রাইত বইয়া রইছি। দুই ভাই বইনে হারা রাইত কানছি। ঘরে আমাগ ম্যালা জিনিশ আছিল, একটা কিছু আনতে দেয় নাই। কইছে আর কুনোদিন যুদি বস্তিতে যাই তাইলে আমারে আর আমার ভাইরে মাইরা হালাইব।
মিনু কথা বলল না। বেডরুমের দিকে তাকাল। মমর ঘুম ভেঙেছে কী না দেখল। ভাঙেনি। এতটা বেলা হল এখনও ঘুমোচ্ছে।
সোনা বলল, একখানা কতা কমু খালাম্মা।
খালাম্মা কথাটা বেশ কানে লাগল মিনুর। কখন কোন ফাঁকে সোনা তাকে খালাম্মা ডাকতে শুরু করেছে, আশ্চর্য ব্যাপার মিনু তা খেয়ালই করেনি। মনটা কী রকম করে উঠল তার। বাসা বাড়িতে কাজ করা এই বয়সী ছেলে মেয়েরা বাড়ির কর্ত্রীকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই খালাম্মা বলে ডাকে। সোনাও তাই করছে।
মিনু বলল, কী কথা?
আমারে তো আপনে কইছিল রাইতেও আপনেগ এহেনে থাকতে।
এখনও বলছি। তুই আমাদের বাসায়ই থাকবি। কিচেনে নয়ত ডাইনিং স্পেসে ঘুমিয়ে থাকবি। ড্রয়িংরুমের এক কোণেও থাকতে পারি।
তারপর বেশ চিন্তিত গলায় মিনু বলল, কিন্তু আমরা তো এক সপ্তাহ বাসায় থাকব না। আমার বাবার বাড়ি বেড়াতে যাব।
দিনাজপুরে।
বাসা কেডা থাকব না?
মিনু হাসল। কে থাকবে! আমাদের বাসায় আর আছে কে।
আমি কইতে চাইছিলাম আপনেগ বারিন্দাডা তো খালি পইড়া থাকে, রাইতে আইয়া আমার ভাইয়ে এহেনে খালি ইট্টু ঘুমাইব। বিয়ানে আজানের লগে লগে উইট্টা যাইব গা। আপনেরা যুদি এক হাত্তা না থাকেন তাইলে আমিও আমার ভাইর লগে বারিন্দায় থাকুমনে। ভাইয়ে লোহার পোলে রিকশা ঠেলে। দশ এগেরো টেকা কামায়। অন্য জাগায় থাকনের বেবস্থা অইলেই যাইব গা। খালি কয়ডা দিন।
সে না হয় থাকলি। তোর ভাই রিকশা ঠেলবে, তুই কী করবি?
আমিও ভাইর লগে গিয়া রিকশা ঠেলুম।
রিকশা ঠেলার কাজ মেয়েরাও করে?
হ কত মাইয়ারা করে!
মিনু চিন্তিত গলায় বলল, তোর খালু আসুক। দেখি কী করা যায়।

আনিস বিছানায় কাত হল। তারপর মিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যা বললে সেটি হচ্ছে সামান্য সময়ের জন্য সমস্যাটির একটি সমাধান।
মিনু বসেছিল তার ড্রেসিং টেবিলের সামনে, ছোট্ট একটা কুশনে। বসে নেইল কাটার দিয়ে আস্তে ধীরে বাঁ হাতের নখ কাটছিল। আনিসের কথা শুনে আনিসের দিকে তাকাল না। বাঁ হাতের নখের দিকে তাকিয়ে বলল, সামান্য সময়ের জন্য সমাধান মানে কী! দুটি এতিম ছেলেমেয়ের ঘর দখল করে নেবে একটি লোক দেশে কি আইন কানুন নেই! যার জোর আছে সে যা ইচ্ছে তাই

করবে?
আইনের আশ্রয় অবশ্যই নেয়া যায় কিন্তু আইনের কাছে তো আশ্রয়টা চাইতে হবে! কে চাইবে? সোনা আর সোনার ভাই চাইবে!
ওরা তো ব্যাপারটা বুঝবেই না ওদেরকে সাহায্য করবে কে! ম্যালা দৌড়াদৌড়ি আছে কে করবে ওসব!
এবার নখ কাটা বন্ধ করল মিনু চোখ তুলে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল তুমি করবে। এজন্যেই তো ঘটনাটা তোমাকে বললাম। ওদের নিয়ে পুলিশের কাছে যাও।
আনিস হাসল। এটিই হচ্ছে সামান্য সময়ের জন্যে সমস্যাটির একটি সমাধান। পুলিশ নিশ্চয় ওদের সাহায্য করবে। বস্তিতে গিয়ে রমজানকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে ওদের ঘর ওদের দখলে দিয়ে দেবে। এবং রমজানকে এরেস্টও করবে। তারপর?
তারপর আবার কী! সোনারা ওদের ঘরে থাকবে।
থাকবে তবে মাত্র কয়েকদিনের জন্য।
মানে?
আমাদের সমাজে রমজান তো একজন দুজন নয়। অজস্র। কতজনকে ঠেকাবে তুমি! দুটি নিরীহ শিশু সারাদিন পরিশ্রম করে নিজেদের ঘরে গিয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ঘুমোবে, হয়ত ঘুমঘোরে তাদেরকে গলা টিপে মেরে ফেলবে কোন রমজান। মেরে লাশ গুম করে দেবে। কাকপক্ষিটিও টের পাবে না পরদিন প্রচার করে দেবে পেটের ধান্দায় ঘর ফেলে কোথায় চলে গেছে অনাথ ছেলেমেয়ে দুটো। কে আছে যে ওদের খুঁজবে! কিংবা প্রতি মুহূর্তে রমজানদের হাত থেকে রক্ষা করবে! এমনও তো হতে পারে রাত দুপুরে বস্তির ঘরে আগুন দিয়ে দিল ঘুমঘোরে পুড়ে মরে গেল দুটি শিশু। রমজানরা চিৎকার চেঁচামেচি করে প্রচার করল, প্রমাণ করল শিশু দুটির অসাবধানতার জন্যে ঘরে আগুন লেগেছে নিজেদের আগুনে নিজেরা পুড়ে মরেছে।
আনিসের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল মিনু।
আনিসের কথা শেষ হতেই বলল, তাই তো! এতটা তো আমি ভেবে দেখিনি! এসবের চে তো ওখানে ফিরে না যাওয়া বরং ভাল জীবনের ঝুঁকিটা থাকে না।
হ্যাঁ তাই।
মিনু গভীর করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল তার মানে কী অসহায় এরা! নিজেদের ঘর দখল করে নিল একজন প্রতিবাদ করবে সে উপায়ও নেই প্রতিবাদ করতে গেলে জান যাবে আজ না হোক কাল! আসলেই এই ধরনের শিশুদের বেঁচে থাকার, সুস্থ সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকার, নিরাপদে বেঁচে থাকার কোন নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারছি না এজন্যে সমগ্রজাতি দায়ী, হোল সিস্টেম দায়ী।
মিনু কথা বলল না আবার মনোযোগ দিয়ে নখ কাটতে লাগল।
ড্রয়িংরুমে বেশ শব্দ করে টিভি চলছে। সোনা আর মম টিভি দেখছে শিশুদেরকে প্রাণঘাতী রোগ থেকে রক্ষা করবার কী একটা বিজ্ঞাপন হচ্ছে। কান খাড়া করে বিজ্ঞাপনটা খানিক শুনল আনিস শুনে মনে মনে বলল, সোনা এবং সোনার ভাইর মত শ্রমজীবী অনাথ শিশুদেরকে কোন মন্ত্রবলে রক্ষা করা যাবে সেই মন্ত্র শেখার বিজ্ঞাপনটি কেন দিন না আপনারা!
প্রশ্নটা আনিস কাকে করল কে জানে! মনে মনে হাসল তারপর সিগ্রেট ধরাল সিগ্রেটে বড় করে টান দিয়ে বলল, মিনু তারচে সোনাকে বল ও আর ওর ভাই যেন ভুলেও কখনও ওই বস্তির দিকে না যায়।
মিনু বলল, সে আর আমার বলতে হবে না ওরা খুব ভয় পেয়েছে এমনিতেই আর যাবে না।
তাহলে তুমি যে এত কিছু বললে! আমাকে বললে ওদেরকে সাহায্য করতে!
ওসব আমি নিজ থেকেই বলেছিলাম সোনা খুব কান্নাকাটি করছে দেখে খুব মায়া লাগছিল সোনা কিন্তু আমাকে একবারও বলেনি তুমি গিয়ে ওদের ঘরটা ফিরে পাওয়ার ব্যবস্থা কর।
তাই বল! কিন্তু ওরা এখন থাকবে কোথায়?

www.shopnil.com

সোনা তো আমাদের বাসায়ই থাকতে পারবে মুশকিল হয়েছে ওর ভাইকে নিয়ে।
সোনা নাকি আবার ওর ভাইকে ছাড়া ঘুমোতে পারে না!
বিপদে পড়লে ওসব আহলাদ কি আর থাকে! তবে সোনা এটা অনুরোধ করেছে। বলেছে আমাদের বারান্দাটা তো খালি পড়ে থাকে ওর ভাইকে কদিন যেন ওখানে থাকতে দিই। রাতে এসে শবে ভোরবেলা উঠে চলে যাবে আমরা নাকি টেরও পাব না।
কথা আমাদের অসুবিধা কী!
হ্যাঁ অসুবিধা নেই কিন্তু একটা ব্যাপারে ভাবতে হবে আমরা তো এক সপ্তাহের জন্যে থাকছি না।
তাতে কী!
সোনা থাকবে কোথায়?
তাই তো! এটা তো আমার মাথায় আসেনি।
সোনা অবশ্য আমাকে বলেছে সেও তার ভাইর সঙ্গে আমাদের বারান্দায় থাকবে সারাদিন ভাইর সঙ্গে লোহার পুলে রিকশা ঠেলবে।
সিগ্রেটে টান দিয়ে অতি উৎসাহের গলায় আনিস বলল, হ্যাঁ সোনার মত মেয়েরাও তো রিকশা ঠেলে আমি দেখেছি।
কিন্তু আমি চাইছি না সোনাও তার ভাইর সঙ্গে রিকশা ঠেলুক।
কেন?
রিকশা ঠেলে ওই অতটুকু একেকটা বাচ্চা নাকি দশ এগার টাকা করে রোজগার করে। সোনার যদি এই সাতদিনে নগদ টাকার লোভ একবার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের বাসার কাজে সে আর আসবে না।
না এলে না আসবে।
কথাটা শনার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে বেশ একটা ধমক দিল মিনু। নেইল কাটার ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখে বলল, বেশ সহজে তো বলে ফেললে না এলে না আসবে, মাইনে টাইনে দিতে হবে না এমন একটা কাজের লোক জোগাড় করতে পারবে! তাছাড়া এ কদিনে সোনাকে আমি বেশ কাজ টাজ শিখিয়ে ফেলেছি। আমার সংসারের কাজের ধরনটা সে বুঝে গেছে। বেশ গুছিয়ে সুন্দর করে কাজ করে। মমকে সাংঘাতিক ভাল ভাবে রাখে।
আনিস আবার সিগ্রেটে টান দিল তাহলে কী করবে?
মিনু একটু নড়েচড়ে বসল ভাবছি সোনাকে বাসায় রেখে যাব।
অতটুকু একটি মেয়েকে একা ফ্ল্যাটে রেখে যাবে, এখন তো বস্তিতেও আর থাকে না, যদি চুরিটুরি করে পালায় কোথায় খুঁজব!
পালাতে পারবে না বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাব।
এ্যাঁ!
হ্যাঁ সাতদিনের চাল ডাল তরিতরকারি দিয়ে যাব, রান্না করে খাবে আর ঘুমোবে। ওর ভাই থাকবে বারান্দায়। রাতের বেলা দরোজার এপাশ থেকে ভাইর সঙ্গে কথা বলবে।
ওই দরোজাটা তো ভেতর থেকে খোলা যায়!
মিনু হাসল খোলা যাবে না। কাল মিস্ত্রি ডাকিয়ে দরোজার মাঝখানে দুটো রিং লাগাব। ওই রিঙে তালা লাগিয়ে দেব। ব্যাস!
আনিস চিন্তিত গলায় বলল, সাতদিন এভাবে বন্দি থাকবে যদি অসুখ বিসুখ কিছু হয়! যদি মরে টরে যায়!
ধুৎ বাজে কথা বল না। এই ধরনের শিশুদের অসুখ বিসুখ সহজে হয় না। জন্মের পর অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বড় হয়, রোদে পোড়ে বৃষ্টিতে ভেজে, অসুখ কী হবে এদের! তুমি অত চিন্তা কর না। এসব পুরুষ মানুষদের ভাবনার বিষয় নয়।
তারপর একটু থেকে মিনু বলল, সোনার ফ্রকের কাপড় আর প্যান্ট দুটো যে মনে করে এনেছ!

খুবই ভাল করেছ।
আনিস হাসল তুমি বলেছ আর আমার তা মনে থাকবে না, এ কী করে হয়!
মিনু খুশি হল তাই!
তাই কোচের টিকিটও কাটা হয়ে গেছে এবার সব শছগাছ কর।

সোনা ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগল ব্যাপারটা বেশ মজা লাগছে তার। একরম একটি বাসায় সে সম্পূর্ণ একা তার জন্যে একা। এটি রান্নাঘর বাথরুম ড্রয়িংরুম ডাইনিং স্পেস। ডাইনিং স্পেসের ছবি চেয়ার একটি টেবিল। টেবিলে হালকা নীল রঙের ফুল পাখি প্রজাপতি আঁকা ওয়েলক্লথ বিছানো। ইচ্ছে করলে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর খাবারের প্লেট রেখে অনেকক্ষণ ধরে খেতে পারে সোনা। কেউ দেখবে না। কেউ কিছু বলবেও না।
রান্নাঘরে সোনার জন্যে চাল ডাল তরিতরকারি, বাটা মশলা সব রেখে গেছে মিনু। গ্যাসের চুলর পাশে রেখে গেছে দুটো ম্যাচ। হারিকেন। যদি ইলেকট্রিসিটি না থাকে তাহলে সোনা যেন হারিকেন জ্বেলে নেয়। কলসিতে আছে এক কলসি খাওয়ার পানি। একটা পটে আছে বেশ কিছু আটা। সকাল বেলা রুটি খাবে সোনা। সাত আট দিন চলার মত সয়াবিন তেল আছে। বোতলে চা পাতা সামান্য গুড়ো দুধ এবং চিনি আছে। ইচ্ছে করলে চাও তৈরি করে খেতে পারে সোনা।
রান্না ঘরে ঢুকে তার জন্যে রেখে যাওয়া প্রতিটি জিনিশ খুটিয়ে খুটিয়ে দেখল সোনা। দেখে খুশি হয়ে গেল।
মমরা চলে গেছে খুব সকালে। প্রায় আজানের সঙ্গে সঙ্গে। কালরাতে নাস্তা এনে রেখেছিল। পাউরুটি কলা। তাদের সঙ্গে সোনাও খেয়েছে। এখন তাই একদমই খিদে নেই সোনার। তবু রান্না ঘরে সব কিছু খুটিয়ে দেখতে দেখতে সোনা। একবার ভাবল গ্যাসের চুলো জ্বেলে ভাতটা বসিয়ে দেবে। চুলোটা একদম কমিয়ে রাখবে আস্তে ধীরে যতক্ষণ ইচ্ছে ধরে হোক ভাত। এখন তো মাত্র সকাল। আটটা নটার বেশি হয়ত বাজে না। সোনা তো ভাত খাবে সেই দুপুরে! দেড়টা দুটোর দিকে। ভাত রান্না হওয়ার পর ডাল রাঁধবে। ডাল রান্নার ফাঁকে ফাঁকে আলু বেগুন ফুলকপি এই তিনপদের তরকারি পরিমাণ মত কেটে কুটে একবারে মশলাটশলা দিয়ে সাজিয়ে বসিয়ে দেবে। সুন্দর তরকারি হয়ে যাবে। একবার রাঁধলে রাতের খাবারটাও হয়ে যাবে। একটুকরা মিষ্টি কুমড়ো আছে, দুটো ডিম আছে, ছোট্ট একটা পটে রাখা আছে সামান্য কাচকি মাছের সুটকি। যে কোনটা ইচ্ছে রান্না করে খেতে পারবে সোনা। ডিম সেদ্ধ করতে পারে কিংবা কাঁচা মরিচ পেয়াজ দিয়ে খুব সুন্দর করে ফেটে বেশি করে তেল দিয়ে ফুল ফুলো করে ভাজতে পারে একটা ডিম। ডিম ভাজা আর ডাল দিয়ে ভাত খেতে খুব মজা।
কিন্তু এই সব মজার জিনিশ আজই খাবে না সোনা। আস্তে ধীরে পরে খাবে। আনেকগুলো দিন তো আছে হাতে। আজ এক রোববার সামনের রোববারের পরের দিন সোমবার সন্ধ্যা কিংবা রাতে ফিরে আসবে মমরা। অনেকগুলো দিন একা সোনার। যেদিন যেটা ইচ্ছে খেতে পারবে সে। ইস মানিককেও যদি সোনার সঙ্গে বাসায় রেখে যেত তাহলে কী যে ভাল হত! দু ভাইবোন মনের মত রান্না করে খেত, গল্প করত, খেলত। দুজন দুজনের গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে থাকত।
মানিকের কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল সোনার। রান্নাবান্নার কথা ভুলে গেল সে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।
ডাইনিং স্পেসের এ পাশে হালকা সবুজ রঙের লম্বা ধরনের একটা ফ্রিজ। ফ্রিজে অবশ্য কিছু নেই সকাল বেলা চলে যাওয়ার সময় মমর মা নিজ হাতে ফ্রিজ লক করেছে। সুইচ অফ করে দিয়েছে। সোনার খুব সখ নিজ হাতে ফ্রিজটা একদিন খুলে দেখবে। ফ্রিজ খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে শীতল একটা ভাপ আসে। মমর মা ফ্রিজ খোলার সময় একদিন তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সোনা,

www.shopnil.com

তখন সেই শীতল ভাপ টের পেয়েছিল ভারি ভাল লেগেছিল ব্যাপারটি। মানিকের কথা ভাবতে ভাবতে এই কথাটিও মনে পড়ল সোনার। আনমনা ভঙ্গিতে ফ্রিজটায় একবার হাত বুলাল সে। তারপর ড্রয়িং রুমে চলে এল।

ড্রয়িংরুমে দুটো ছোট আর একটি লম্বা খয়েরি রঙের নরম সোফা। একপাশে দেয়ালের সঙ্গে মাঝারি ধরনের একটা শকেস। শকেসের ওপরের তাকে নানা রকমের টুকটাক জিনিসপত্র আর নিচের দুটি তাকে চায়ের কাপ গ্লাস কাঁচের ফ্লাক নানা রকমের চামচ, এসব। শকেসটিও লক করা।

আগে এই রুমে ছিল টেলিভিশানের ট্রলি। ট্রলির ওপরের তাকে টেলিভিশান আর মাঝের তাকে ছিল একটা কাল রঙের টেপরেকর্ডার। ট্রলিটা বেডরুমে রেখে গেছে মমর মা। বেডরুমটি লক করা। সেই রুমে সোনা ঢুকতে পারবে না ঢোকার অবশ্য দরকারও নেই। সোনার বেশির ভাগ সময় কাটবে ড্রয়িংরুমে। ড্রয়িংরুমের বাইরের দিকটার দরোজার সামনে শবে সে, দরোজার ও পাশে বারান্দায় শবে মানিক। দুজন দুজনকে দেখতে পাবে না কিন্তু কথা তো বলতে পারবে! কথা বলতে বলতে কখন ঘুমিয়ে পড়বে টের পাবে না!

ড্রয়িংরুমে ঢুকে লম্বা সোফাটার দিকে তাকাল সোনা। এই সোফায় তার বসা নিষেধ। মমর মা বলে দিয়েছে। কাজের লোকরা সোফায় বসে না। সোনা যখন মমর সঙ্গে ড্রয়িংরুমে থাকে, যখন টিভি চলে মম হাত পা ছড়িয়ে আহলাদি ভঙ্গিতে বসে থাকে সোফায় আর সোনা গুটিশুটি হয়ে বসে মেঝেতে, মমর পায়ের কাছে। আজ বাসায় সোনা একা। একবার সোফায় বসে দেখবে বসতে কেমন আরাম লাগে!

আস্তে করে বড় সোফাটার এক কোণে বসল সোনা। বসার সঙ্গে সঙ্গে কোমর অব্দি ডুবে গেল তার। ইস কী নরম, কী আরামের সোফা!

বসে বসেই দু তিনবার দোল খেল সোনা। হি হি করে একাকি একটু হাসল। তারপর হঠাৎই ড্রয়িংরুমের বাইরের দিককার দরোজাটির দিকে তাকাল। দরোজার মাঝখানে মোটা কাল লোহার দুটোরিঙ লাগান হয়েছে। রিঙের মাঝখানে বেশ ভারি ধরনের একটা তালা। তালাটির দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল সোনার! আবার মানিকের কথা মনে পড়ল। কোথায় তালা বন্ধ ঘরে বন্দি হয়ে আছে সোনা আর কোথায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রিকশা ঠেলছে মানিক।

মানিকের রিকশা ঠেলার কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে কেমন অপরাধী লাগল সোনার। সে এরকম আরামদায়ক একটা সোফায় কোমর ডুবিয়ে বসে আছে আর তার ভাইটি শরীরের যাবতীয় শক্তি একত্র করে আটআনা পয়সার জন্য যাত্রী কিংবা মাল বোঝাই রিকশা ওই অতটা উপরে ঠেলে তুলছে! রিকশা ঠেলার পরিশ্রমে ফোস ফোস করে শ্বাস পড়ছে তার। বুক হাপড়ের মত ওঠানামা করছে। ব্যথায় টনটন করছে দু হাত, দু পা। দাঁতে দাঁত চেপে আছে, মুখটা গেছে বিকৃত হয়ে, ঘামে জবজব করছে শরীর। এসব ভেবে সোফা থেকে লাফিয়ে উঠল সোনা ভাইটি। তার এত পরিশ্রম করছে আর সে করছে আরাম, এ হয় না।

বাথরুম থেকে ছোট বালতি ভরে পানি আনল সোনা। তারপর ঘরদোর মোছার ন্যাকরা নিয়ে দ্রুত হাতে ড্রয়িংরুমের মেঝে মুছতে লাগল। দেখতে দেখতে ঘাড়ে গলায় ঘাম জমে উঠল। তার নাক মুখ দিয়ে ফোস ফোস করে উষ্ণ শ্বাস পড়তে লাগল। বুক হাপড়ের মত ওঠা নামা করতে লাগল।

ভাতঅলা বলল, কী দিয়া খাবি?

ভাতের বিশাল হাড়িটির পাশে ফুটপাথের ওপর আসন পিঁড়ি করে বসল মানিক। ঘামে জবজব

করছে মুখ, গলা লুঙ্গির খুঁটে মুখ গলা মুছল। তরকারি কী আছে আইজ?

চাইর পাঁচ পদের তরকারি আছে ইলশা মাছ, নলা মাছ, বাইলা মাছ, গরুর শস আছে, বড় বড় আলু সিদ্ধ কইরা ঝোল করছি আর ডাইল।

সবচে সস্তায় কী খাওন যাইব?

ভাতঅলা হাসল ডাইল আর ভাত।

কত লাগব?

ভাত দুই টেকা আর ডাইল আটআনা। আড়াই টেকা।

দেও।

তারচে আর আটআনা বেশি দিলে ভালা জিনিশ খাইতে পারচ। তিন টেকায় শলআলুর ঝোল আর ভাত। ঝোল বেশি দিমুনে। ডাইলের কাম চইলা যাইব। আলুডা বড় দেইখা দিমুনে খাইয়া আরাম পাবি।

না থাউক।

আরে খা বেডা। একখান রিকশা ঠেলার পয়সা। আড়াই টেকা দিলে তিন টেকা দিতে পারবি না ক্যা!

না আটআনা পয়সার দাম আছে আমার। তুমি আমারে ডাইল ভাতই দেও।

খা তর যা মন চায় আমার কী! তুই যা চাবি আমি তাই দিমু।

টিনের প্লেটে মোটা চালের ভাত, ভাতের ওপর প্লাস্টিকের চায়ের কাপের এক কাপ ডাল সামান্য লবন আর একটা কাঁচা মরিচ দিয়ে প্লেটটা মানিকের দিকে এগিয়ে দিল ভাতঅলা। মানিক কোন দিকে না তাকিয়ে খেতে শুরু করল। মানিকের বয়সী দুটো ছেলেও খাচ্ছিল। মানিক যখন খেতে শুরু করেছে তখন ওদের খাওয়া শেষ। ভাতঅলার পয়সা মিটিয়ে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল তারা। ওদের দিকে এবার তাকিয়ে দ্রুত খেতে শুরু করল মানিক।

ভাতঅলা লোকটা বয়স্ক। মানিকের এত দ্রুত ভাত খাওয়া পছন্দ করছিল না সে। লোকটার স্বভাব হচ্ছে থমকে কথা বলা। এখনও তেমন সুরেই বলল, ওই বেডা আস্তে খা। এমনে খাইলে গলায় ভাত আইটকা মরবি।

মানিক হাসল মরুম না যত তাড়াতাড়ি খাইতে পারি তত লাভ। একটা রিকশা বেশি ঠেলতে পারলে আটআনা পয়সা।

এত পয়সা দা করবি কী! সংসারে আছে কে?

খালি একটা বইন। বইনে মাইনষের বাসায় কাম করে।

তাইলে এত পয়সা দিয়ে করবি কী? দুই বেলা আমার এহেনে ঐ খাচ পাঁচ ছয় টেকার বেশি তো খাচ না। বিয়ানে নাস্তা খাচ কয় টেকার?

দেড় টেকার বেশি খাই না।

সব মিল্লা সাত আট টেকা দিনের খরচা। কামাচ কত?

পয়লা পয়লা বেশি কামাইতে পারতাম না। দুই তিনদিন থইরা ভালা কামাই। আইজ থিকা বিশ পঁচিশ টেকার কাম না অইলে বাড়িতে ফিরুম না।

বাড়ি ফেরার কথাটা বলে ভেতরে ভেতরে কেমন দুঃখি হয়ে গেল মানিক। বাড়ি আর কোথায় তার, ঘর আর কোথায়! সে তো এখন সোনা যে বাড়িতে কাজ করে সেই বাড়ির বারান্দার বাশিন্দা।

ভাতঅলা বলল, থাকচ কই?

লোকটার এত কথা পছন্দ করছিল না মানিক। তবু রাগ করল না ভাত খেতে খেতে বলল, আগে বস্তিতে থাকতাম অহন এক বাসার বারিন্দায় থাকি।

তাইলে আর কী! ম্যালা পয়সা কামাচ খাওন দাওন ভালা কইরা কর। যেই কাম করচ ভালা না খাইলে তো শইল টিকব না। মইরা যাবি।

www.shobnil.com

ভাত খাওয়া শেষ করে ঢকঢক করে পুরো একগ্লাস পানি খেল মানিক। তারপর লুঙ্গির খুঁটে মুখ মুছে বলল, ম্যালা পয়সার দরকার আমার, বুজলা! একখান লুঙ্গি কিনোন লাগব, একখান পিরন কিনোন লাগব। যা পিনদা আছি এই ছাড়া আমার আর কিছু নাই। তারবাদে এমনে তো দিন যাইব না। বস্তিতে একখান ঘর ভাড়া লমু। বইনডারে লইয়া থাকমু। বইনডা আর আমি জমযা ভাই বইন। জন্মের পর দুইজন দুইজনরে ছাইড়া কুনোদিন থাকি নাই। কাইল থিকা আছি। রাইতে আমি আর গুমাইতে পারি নাই। গুমের তালে এইদিক ওইদিক আতাইছি বইনরে না পাইয়া বুকটা ধব কইরা উঠছে আর গুমাইতে পারি নাই। খালি মনে অইছে আমারে ছাইড়া আমার বনইডা জানি কই গেছে গা। বইনের লগে আমার আর দেহা অয় নাই। তয় আমি জানি আমার বইনেরও রাইতে আমার লেইগা এমুন লাগছে। বইনেও গুমাইতে পারে নাই।

লুঙ্গির কোচর থেকে এক টাকার তিনটে নোট বের করে ভাতঅলার হাতে দিল মানিক।

আড়াই টাকার ভাত খেয়ে দু টাকার সঙ্গে খুচরো আটআনা না দিলে ভাতঅলা খুব রাগ করে। সবাই টাকা ভাঙিয়ে শুধু খুচরো পয়সা নিতে চায় এত খুচরো পয়সা সে পাবে কোথায়! অবশ্য তার দোকানের যারা কাস্টমার খুচরো পয়সার খুব দরকার তাদের। রিকশা পিছু ঠেলা হচ্ছে আটআনা। লোকে এক টাকার নোট দেয়। আটআনা ফেরত দিতে হয়। ভাংতি পয়সা না থাকলে পয়সাটাই অনেক সময় মার যায়। আবার কখনও কখনও দয়ালু রিকশা যাত্রীরা পুরো টাকাটাই দিয়ে দেয় অবশ্য তাদের সংখ্যা খুবই কম পৃথিবীতে দয়ালু লোকের সংখ্যা একেবারেই কমে গেছে। এই কারণে ঠেলাঅলারা অন্য কাজে ভাংতি পয়সা হাত ছাড়া করে না।

কিন্তু ভাতঅলা লোকটাই বা এত ভাংতি পয়সা পাবে কোথায়! মানিক আড়াই টাকা খেয়ে তিন টাকা দিয়েছে, তাকে আটআনা ফেরত দিতে হবে দেখে একবার ক্ষেপে উঠতে চাইল লোকটা, তারপর কী ভেবে ক্ষেপল না। বুক পকেট থেকে একটা চকচকে আধুলি বের করে মানিকের হাতে দিল।

ড্রয়িংরুমের বাইরের দিককার দরোজায় পিঠ ঠেকিয়ে খুবই অসহায় ভঙ্গিতে মেঝেতে বসে আছে সোনা। ঘরের ভেতর ঝকঝকে আলো জ্বলছে কিন্তু ভারি স্তব্ধ হয়ে আছে চারদিক। রাস্তায় লোকজনের চলাচলও কমে গেছে। রাত কত হল কে জানে! মানিক এখনও ফিরছে না! এতরাত অব্দি কী করছে সে! কত রিকশা ঠেলে!

মা বেঁচে থাকতে কোন কোন রাতে কাজ থেকে ফিরতে খুব দেরি করত সোনা আর মানিক তাদের বস্তির ঘরে কুপি জ্বালিয়ে মার অপেক্ষায় বসে থাকত। ওরকম এক রাতে মানিক একবার বলল, সোনা আয় আমরা মনে মনে একশ বার মারে ডাকি, দেখবি ওই একশ বার ডাকের মইদ্যে মায় আইয়া পড়ব।

সত্যি সত্যি একশ বারের ডাক পূর্ণ হওয়ার আগেই মা সে রাতে চলে এসেছিল। মাকে দেখে আনন্দে দুভাইবোন হাততালি দিয়ে উঠেছিল।

তারপর মা ফিরতে দেরি করলেই ওরকম করত সোনা মানিক। কোন কোন রাতে ডাকের মধ্যে ফিরে আসত মা, কোন কোন রাতে ফিরত না।

আজ অনেকদিন পর কথাটা মনে পড়ল সোনার। আগে দুভাইবোন এক সঙ্গে মাকে ডাকত, এখন মা নেই, ভাইবোন দুটিও বিচ্ছিন্ন। ভাইয়ের অপেক্ষায় রাত জেগে বসে আছে বোন। যদিও ভাই ফেরার সঙ্গে বোনের দেখা হবে না, তালাবন্ধ দরোজার এপাশ ওপাশ থেকে কথা হবে দুজনার, দুজন দুপাশে শুয়ে থাকবে, একেবারেই পাশাপাশি, কিন্তু কেউ কাউকে ছুঁয়ে দেখতে পারবে না, তবু বোনটি এ সময় মনে মনে তার ভাইকে ডাকতে লাগল, ভাই কই তুই! কী করচ এতক্ষণ! আয় তাড়াতাড়ি আয়।

www.shopnil.com

একশবার, দুশবার না, তিনশবার কতবার এভাবে মানিককে ডেকেছে সোনা, সোনার এখন সে কথা মনে নেই। হঠাৎ টুকটুক করে শব্দ হল দরোজায় সোনা চমকে উঠল। ভাইকে ডাকতে ডাকতে কী রকম একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। সে ঘোরটা মুহূর্তে কেটে গেল। দরোজার দিকে মুখ ফিরিয়ে উতলা গলায় বলল, ভাই আইছচ? আ?

দরোজার বাইরে থেকে সাড়া দিল মানিক হ আইছি।

তারপর কী রকম ক্লান্তির একটা শব্দ করল। সেই শব্দটা বুকে এসে লাগল সোনার। সোনা বলল, এত দেরি করলি ক্যা?

কাম করলাম।

এত রাইত তরি কাম করনের কাম কী?

মানিক হাসল কাম না করলে পয়সা পামু কই!

কয় টেকার কাম করছচ আইজ?

বাইশ টেকার।

কচ কী এত টেকা!

হ। তয় জানডা শেষ অইয়া গেছে রে। আত পাও ভাইঙ্গা আইতাছে।

হুইয়া পড়।

হুইয়া পড়ছি।

ভাত খাইছচ?

খাইছি।

কি দিয়া খাইলি?

ডাইল দিয়া।

দুইফরে?

দুইফরেও ডাইল দিয়া খাইছি।

ক্যা দোকানে আর কোন তরকারি আছিল না?

আছিল।

খচ নাই ক্যা?

ম্যালা দাম।

এত টেকা কামাইছচ, দাম দিয়াই খাইতি!

না। খাইয়া পয়সা নষ্ট করুম না। একহাপ্তা দুইবেলা খালি ডাইল ভাত খামু পয়সা জমাইয়া লুঙ্গি আর পিরন কিনুম। তারবাদে অন্য বস্তিতে ঘর ভাড়া লমু। তরে ছাড়া আমি থাকতে পারি না। কাইল রাইতে গুম আহে নাই আমার।

মানিকের শেষ দিককার কথাগুলো শুনতে পেল না সোনা। মানিক দুবেলাই ডাল দিয়ে ভাত খেয়েছে শুনে বুকের ভেতরটা কী রকম মোচর দিয়ে উঠল তার। সে আজ দুবেলাই খুব ভাল তরকারি দিয়ে ভাত খেয়েছে। গোলআলু আর বেগুন কুচি কুচি করে কেটে তার সঙ্গে কাচকি মাছের সুটকি। খুব স্বাদ হয়েছিল তরকারিটার। দুবেলাই ওই স্বাদের তরকারি দিয়ে পেট পুরে ভাত খেয়েছে সে। আর তার ভাইটি খেয়েছে শুধু ডাল দিয়ে। আগামি এক সপ্তাহও শুধু ডাল দিয়েই খাবে সে।

সোনা মনে মনে বলল, ভাই তুই যেই কয়দিন ডাইল দিয়া ভাত খাবি আমিও সেই কয়দিন ডাইল দিয়াই খামু। অন্য কোন তরকারি দিয়া খামু না। তরে ছাইরা কোন ভাল জিনিশ খাইতে আমার ভাল লাগব না তুই যা খাবি আমিও তাই খামু।

মানিক বলল, বইন তুই ভাত খাইছচ?

সোনা বলল, খাইছি

তারপর খাওয়া নাওয়া নিয়ে মানিক যাতে আর কোন প্রশ্ন না করে এইজন্যে কথা ঘুরিয়ে

ঘুরিয়ে দিল সোনা। বলল, ভাই আমার জানি কেমুন লাগতাছে একটা বাসায় আমি একা। বেবাক দরোজায় তালা দেওয়া সাত আষ্ট দিন এই ঘর থিকা বাইর অইতে পারুম না আমি। পয়লা পয়লা বুঝি নাই। ভারি আমোদ লাগতাছিল মনে অইতাছিল একলা থাকুম, হারাদিন তুই থাকবি না, রাইতে দরজার এই পাশ থিকা তর লগে কতা কমু, যহন ইচ্ছা গুমামু যহন ইচ্ছা উডুম, যহন ইচ্ছা খামু যহন ইচ্ছা নাহামু, কত জানি মজা লাগব! আইজ একদিনেই খারাপ লাগতাছে আমার বিয়ানে হেরা যাওনের পর থিকা মনে অইতাছে দিনডা কত জানি বড়। দিন শেষ অয় না। সন্ধ্যা অয় না, রাইত অয় না তুই আহস না কেমুন যে লাগতাছিল আমার!

কথাগুলো সোনা এক নাগাড়ে বলে গেল এই জন্য, সে ভাত খেয়েছে শুনে মানিক যদি জিজ্ঞেস করে কী দিয়া খাইলি ভাইকে তো মিথ্যে কথা সোনা বলতে পারবে না, সত্য কথা যে বলবে, মানিকের মনে যদি কষ্ট হয়!

সোনার কথা শুনতে শুনতে মানিক অবশ্য খাওয়া দাওয়ার কথাটা ভুলে গেল বুক কাঁপিয়ে ভারি এটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। কী রকম মন খারাপ করা গলায় বলল, বস্তির ঘরডা থাকলে আর এই রকম অইত না রমজান ভাইয়ে ঘরডা দখল না করলে রাইতে তো তুই আর আমি এক লগেই থাকতে পারতাম।

সোনা বলল, হ তারা তো তহন আর ভিতরে আমারে রাইকা বাসা তালা দিয়া যাইত না, আমিও থাকতাম না। আমি বস্তিতে থাকতাম দরকার অইলে তর লগে গিয়া রিকশা ঠেলতাম দুই ভাই বইনে এক লগে গুমাইতাম। তয় আমি কইলাম তাগো একবার কইতে চাইছিলাম, আমি ভিতরে থাকুম না আমি আমার ভাইর লগে হারাদিন রিকশা ঠেলুম আর রাইতে আইয়া আপনেগ বারিন্দায় হুইয়া থাকুম। কইলাম না হেরা যদি রাজি না অয়, যদি রাগ কইরা কয় যা তরে রাখুম না, তর ভাইয়েও বারিন্দায় থাকতে পারব না, তাইলে তুই আর আমি থাকুম কই! হারাদিন রিকশা ঠেইলা রাইতে যদি গুমানের জাগা না পাই তাইলে তো পরদিন আর রিকশা ঠেলন যাইব না!

না এইতাই ভালা অইছে। আর রিকশা ঠেলন ভারি কষ্ট। তুই পারতি না।

তুই পারলে আমি পারুম না ক্যা!

পোলারা যা পারে মাইয়ারা তা পারে না।

দুই ভাইবোনই তারপর একটু চুপ করে থাকে। বেশ খানিকটা সময় কেটে যায়।

সোনার একসময় হঠাৎ মনে হয় মানিক কি ঘুমিয়ে পড়ল! ব্যস্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, ভাই ঘুমাইয়া পড়ছস নি?

মানিক ক্লান্ত, নরম গলায় বলল, না। কাম থিকা ফিরা মনে অইল হোয়নের লগে লগে গুমাইয়া যামু, অহন হুইয়া পড়নের পর গুম আর আইতাছে না।

ক্যা! আমি কতা কইতাছি দেইখা!

মানিক চুপ করে রইল।

সোনা বলল, বুঝছি একলা গুম আহে না তর। আমি লগে নাই কেমনে গুম আইব! আমারও তরে ছাড়া গুম আইতে চায় না ভাই। কাইল রাইতে ইট্টুও গুমাইতে পারি নাই। খালি মনে অইছে তর কাছে যাইগা। গিয়া তর গলা প্যাচাইয়া ধইরা গুমাই। একবার দরজা খুইলা বাইর অইয়া যাইতে চাইছিলাম। আবার চিন্তা করলাম বাইর অইলেও তো তর কাছে যাইতে পারুম না। বড় গেইট তো রাইতে তালা দিয়া রাখে!

তারপর একটু থেমে সোনা বলল, কাইল গুমাই নাই, মনে করলাম আইজ হারাদিন পইড়া গুমামু। হুইলাম গুম আইল না তর কতা মনে অইল। মনে অইল আমার ভাইডা জান পানি কইরা রিকশা ঠেলতাছে আর আমি ঘরে হুইয়া আরামে গুমামু। গুম আইল না। উইট্টা ঘরের কাম করলাম।

মানিক মৃদু শব্দে হাসল। তুই একটা পাগল। আরে ভাই বইনে কি সব সময় এক লগে থাকতে পারে! কোন না কোনদিন তো আলাদা হইয়াই যায়। তুই আরও বড় অওনের পর কী তুই আর আমি এক লগে গলা প্যাচাইয়া গুমাইতে পারুম! অহন থিকাই আলাদা থাকন ভালা।

মানিকের কথা শুনে কী রকম অভিমান হল সোনার! কিছু একটা বলতে যাবে সে তার আগেই মানিক বলল, গুম না আহনের আর একখান কারণ আছে। কাতা কাপোড় কিচ্ছু নাই, বালিশ নাই, বেবাক তো রমজান ভাইয়ে রাইখা দিল, এই সবছাড়া খালি একটা জাগায় হুইলে গুম অয়নি! শইল বেদনা করে।

সঙ্গে সঙ্গে সোনার মনে হল কাল রাতেই বেশ ভাল একটা বিছানা দিয়ে দেয়া হয়েছে সোনাকে। ছেঁড়াখোঁড়া বেশ মোটা, বেশ বড় এটা কম্বল আর তেল চিটচিটে একটা বালিশ কম্বলটা দু ভাঁজ করে বিছালে বেশ নরম বিছানা হয়। বালিশ ভাল। শুতে খুব আরাম কাল রাতে ওই কম্বল বিছিয়েই ডাইনিং স্পেসে শুয়েছিল সোনা কিন্তু আজ আর ডাইনিং স্পেসে শবে না আজ শবে এখন যেখানে বসে আছে সেখানে। রাতের খাওয়া সেরে কিচেন আর ডাইনিং স্পেসের আলো নিভিয়ে কম্বল আর বালিশ নিয়ে ড্রয়িংরুমে চলে এসেছে সোনা। সেই কম্বল আর বালিশ পড়ে আছে দূরে। বিছানা করেনি সোনা। ভেবেছে মানিক আসার পর, মানিকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিছানা করবে। তারপর লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়বে আর যতক্ষণ ঘুম না আসবে ভাইবোন অবিরাম কথা বলে যাবে। কিন্তু বিছানা নেই, শক্ত মেঝেতে শুয়ে ঘুমোতে পারে না মানিক, শরীর ব্যথা করে তার একথা শুনে বুকের ভেতর কেমন যে করে উঠল সোনার! ভাইটি তার শক্ত মেঝেতে শুয়ে, শরীরের ব্যথায় ঘুমোতে পারবে না আর সে নিজে নরম বিছানায় শুয়ে, মাথার তলায় বালিশ, আরামে ঘুমোবে এ হয় না।

সোনা মনে মনে বলল, ভাই আইজ থিকা আমিও বিছনায় হমু না। আমিও তর লাহান খালি জাগায় হুইয়া থাকুম। তর লাহান আমারও যেন শইল্লের বেদনায় গুম না আহে।

কম্বল এবং বালিশটির দিকে ফিরেও তাকাল না সোনা। মাথার ওপর দেয়ালের সঙ্গে সুইচবোর্ড, সুইচ পিটে আলো নেভাল সে। তারপর দরোজার সঙ্গের মেঝেতে শুয়ে পড়ল।

মানিক বলল, লাইট নিবাইয়া দিলি নি?

সোনা বলল, হ।

বিছনা করছস?

মুহূর্তকল থেকে কি ভাবল সোনা! তারপর চালাকি করে বলল, বিছনায় হুইলে গরম লাগে চাইর দিক দিয়া বন্দ তো, ঘরের ভিতরে ম্যালা গরম। সিমিটে হুইলে আরাম লাগে।

ঘরে ফ্যান নাই?

আছে।

তাইলে ফ্যান ছাইড়া ল ঘর ঠাণ্ডা লাগব। আরামে গুমাইতে পারবি।

সোনা মনে মনে বলল, ভাই তরে ছাইড়া ফ্যানের হাওয়া আমার ভালা লাগব না।

মুখে চালাকি করে বলল, ফ্যানের শোঁ শোঁ আওয়াজ আমার ভালা লাগে না। তারচে গরম ভালা।

মানিক হাসল। তুই একটা পাগল।

সোনা কথা ঘোরাল। ভাই তুই নতুন লুঙ্গি পিরন কিনবি কবে?

চাইর পাচ দিনের মইদ্যে কিন্না হালামু। চাইর পাচ দিন টেকা জমাইলে লুঙ্গি পিরনের টেকা অইয়া যাইব।

পিনবি কবে?

যেদিন কিনুম হেদিনই পিন্দুম।

না হেদিন পিন্দিস না। হেরা আমারে নতুন ফরক আর প্যান দিছে। দুইডা প্যান আর একখান ফরকের কাপোড় আনছিল খালু। খালায় নিজ আতে ফরক বানাইয়া দিছে। পয়লা কইছিল বেড়াইয়া আইয়া বানাইয়া দিব। কী মনে কইরা কাইলই বানাইয়া হালাইছে। আমারে আজ সকালে দিছে তয় আমি পিন্দি নাই। আমি নতুন প্যান ফরক পিন্দুম তুই দেখবি না, আমার কেমুন জানি লাগব ভালা লাগব না। এর লেইগা পিন্দি নাই। আমি তো এই কয়দিন বাইর

www.shopnil.com

[illegible] পারাম না [illegible] তরে সেইডাতেও পারুম না। তুই লুঙ্গি পিরন কিনবি কি এই মঙ্গলবারের পরের মঙ্গলবার [illegible] ফিরা আইব সমবার রাইতে। মঙ্গলবার বিয়ালে নতুন [illegible] [illegible] পিন্দা তর লগে [illegible] বাইর অমু আমি। তুই নতুন লুঙ্গি পিরন পিন্দা এই বাসার গেটের সামনে আবি। তারপরে দুই ভাই বইনে আইতে আইতে [illegible] কোনখানে বেড়াইতে যামু গা।
মানিক ঘুম ঘুম গলায় বলল, আইচ্ছা।
তারপর একটু থেমে মানিক বলল, আমার ঘুম আইতাছে। তুইও ঘুমা বইন মেলা রাইত অইছে।
সোনা বলল আইচ্ছা।
কিন্তু দু ভাইবোনের একজনেরও ঘুম আসে না। একজনের কেবলই মনে হয় আরেক জনের কথা। একজনের কেবলই ইচ্ছে করে আরেক জনের কাছে যেতে। বোন কাছে গেলেই যাবতীয় সুখ একজন আরেক জনকে জড়িয়ে ধরলেই যেন তাদের চোখে নেমে আসবে পৃথিবীর গভীর গভীরতর ঘুম। শরীরের পরতে পরতে জমে থাকা ক্লান্তি কেটে যাবে মুহূর্তে।
কিন্তু মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে তালাবন্ধ বিরাট এক দরোজা। এই দরোজা খোলার সাধ্য তাদের নেই। চাবি চলে গেছে স্বার্থপর মানুষের হাতে।

পুলের দুপাশেই ঠেলাঅলাদের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। এক শ্রেণীর ছেলে বুড়ো এমন কি কিছু কিছু তাগড়া জোয়ান পুরুষমানুষ, দু একজন মহিলা, দু চারটি বাচ্চা মেয়ে যাদের জন্য কোথাও কোন কাজের ব্যবস্থা নেই, তিনবেলার আহার জোগাবার জন্যে ভিক্ষে করা ছাড়া কোন উপায় নেই তার। এই পুলের দুপাশে এসে ভিড় করছে। একটা রিকশা ঠেলে পুলের ওপর তুলতে পারলেই আটআনা। সকাল থেকে রাত অব্দি মেরে কেটে বিশ তিরিশটা রিকশা তো ধরা যায়ই। দশ পনের টাকা অনায়াসেই রোজগার। ফলে হচ্ছে কী প্রতিদিনই ঠেলাঅলাদের সংখ্যা বাড়ছে। প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে দুটি চারটি করে নতুন মুখ। ভেতরে ভেতরে শুরু হয়ে গেছে এক ধরনের প্রতিযোগিতা। কে কার আগে ছুটে গিয়ে রিকশা ধরবে।
এই পুলটির দুপাশে মোট চারটে রাস্তা। একেক পাশ থেকে দুটি করে রাস্তা এসে পুলে উঠেছে। আবার নেমেও গেছে একই ভাবে। আগে পুলে ওঠার ঠিক মুখে রিকশার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকত ঠেলাঅলারা। হাতের কাছে রিকশা পেলেই ছুটে গিয়ে ধরত যাত্রী কিংবা রিকশাঅলার অনুমতি নিয়ে রিকশা ঠেলে পুলের ওপর তুলে দিত তারপর আটআনা পয়সা মজুরি নিয়ে মনের সুখে আগের জায়গায় এসে অপেক্ষা।
এখন ঠেলাঅলা বেড়েছে প্রতিযোগিতা বেড়েছে। পরে পুলের ঠিক মুখে দাঁড়ালে আর হয় না। দাঁড়াতে হয় অনেকটা দূরের রাস্তায় গিয়ে। পুল মুখো রিকশা দেখলেই, যাত্রী কিংবা [illegible] রিকশা দেখলেই ছুটে গিয়ে ধরে তাও কে কার আগে ধরবে সেই প্রতিযোগিতা তো আছেই। বুড়, বাচ্চা ছেলে মেয়ে এবং মহিলা ঠেলাঅলারা এই প্রতিযোগিতায় কয়েকদিন ধরে একদম কুলোতে পারছে না। তাগড়া জোয়ান পুরুষ ঠেলাঅলা জুটেছে। গায়ে অসুরের মত শক্তি একেক জনের। ঘোড়ার মত ক্ষিপ্রগতি। রিকশা দেখলেই চোখের পলকে ছুটে গিয়ে ধরে দ্রুত ঠেলে পুলের ওপর তুলে দেয়। রিকশাঅলারা এবং যাত্রীরাও পছন্দ করতে শুরু করেছে তাদের কারণ তাগড়া জোয়ান ঠেলাঅলা হলে রিকশাঅলাদের আরাম গায়ের জোর খুব কম খাটিয়েই রিকশা তারা পুলের ওপর তুলতে পারে। বুড়ো কিংবা বাচ্চা ছেলেমেয়ে হলে, মহিলা হলে সেই সুযোগ নেই। ঠেলাঅলা নেয়ার পরও রিকশা টেনে পুলের ওপর তুলতে জানটা তাদের বেরিয়ে যায়। এই কারণে মানিকদের বয়সী ছেলেমেয়েগুলো, হাড় জিরজিরে বুড়ো এবং মহিলাদের হঠাৎ করেই একটা দুর্দিন শুরু হয়েছে। যেখানে পনের বিশ টাকা তো বটেই এখনও কখনও পঁচিশ

তিরিশ টাকাও রোজগার করত তারা। সেখানে তাদের রোজগার নেমে এসেছে আট দশ টাকায়। আট দশ টাকায় একজন মানুষেরই তো তিন বেলার আহার জোটে না। যাদের সংসারে আরও মানুষজন আছে তাদের কী হবে! নিজে খেয়ে বেঁচে থাকবে না সংসারের অন্যান্য মানুষের দিকে তাকাবে!
মানিকের অবশ্য অন্য কারু দিকে তাকাবার দরকার নেই। সংসারে তার আছেই বা কে? মাত্র বোন সোনা। সে তো বাসা বাড়িতে কাজ করে। ভাল খায়, ভাল পরে, আরামে ঘুমোয়। আট দশ টাকা রোজগার করলে একাকী অনায়াসে চলে যায় মানিকের। দুবেলা ডাল ভাত খেলে, সকালে এক দেড় টাকার নাস্তা, সাড়ে ছটাকা কিংবা সাত টাকার মধ্যে তিনবেলা পার। তারপরও দু চারটি টাকা হাতে থাকে।
তবু মানিকের উদ্বেগের সীমা পরিসীমা নেই। টাকার দরকার, মেলা টাকার দরকার তার। আগামী মঙ্গলবার লুঙ্গি পিরন কিনবে। নতুন লুঙ্গি পিরন পরে সোনাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে। সোনা যে বাড়িতে কাজ করে তারা নতুন জামা প্যান্ট দিয়েছে সোনাকে। সেই জামা প্যান্ট তুলে রেখেছে সোনা। পরেনি। মঙ্গলবার পরবে। নতুন জামা প্যান্ট পরে ভাইর সঙ্গে বেড়াতে বেরুবে। সোনার সেই স্বপ্ন কিছুতেই ভেঙে দেবে না মানিক। যেমন করেই হোক মঙ্গলবার নতুন লুঙ্গি পিরন সে কিনবেই! শখানেক টাকার দরকার। হাতে দিন আছে মাত্র পাঁচটি। গত কয়েকদিনের রোজগার থেকে জমেছে চল্লিশ টাকা। আরও ষাট টাকার ব্যাপার। প্রতিদিন বার টাকা করে জমালে পাঁচদিনে ষাট টাকা হবে কিন্তু আট দশ টাকার বেশি কিছুতেই রোজগার করতে পারছে না মানিক। বার টাকা করে প্রতিদিন জমাবে কী করে! না খেয়ে থাকলেও তো বার টাকা করে জমবেনা! এসব ভেবে আজ সকাল থেকেই ভারি হতাশ লাগছে মানিকের! কী করবে সে!
তারপর আরও কত স্বপ্ন আছে মনে। কোন একটা বস্তিতে ঘর ভাড়া নেবে। সোনাকে বলবে সারাদিন কাজ করে রাতে এসে তার সঙ্গে থাকতে। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত দুটি ভাইবোন বস্তির অন্ধকার ঘরে গলা জড়াজড়ি করে শুয়ে নিজেদের জীবনের সুখ দুঃখের গল্প করবে। গল্প করতে করতে সারাদিনের ক্লান্তির কথা ভুলে যাবে। নিজেদের অজান্তে কখন গভীর ঘুম নেমে আসবে তাদের চোখে, দুজনের একজনও তা টের পাবে না।
রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আনমনা ভঙ্গিতে এসব ভাবছে মানিক। হঠাৎ কে একজন তাকে বেশ একটা ধাক্কা দিল। ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠল মানিক। তারপরই খয়রাকে দেখতে পেল। কখন মানিকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, মানিককে ধাক্কা দিয়েছে।
খয়রাও মানিকের বয়সী। মানিকের মত রিকশা ঠেলার কাজ করে। মানিকের অনেক আগ থেকেই করছে। মানিকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে দু তিনদিন আগে। খয়রা বেশ চটপটে স্বভাবের ছেলে। কথা বলে মজা করে, হেসে কিংবা ঠাট্টার সুরে।
এখনও ঠাট্টার সুরেই কথা বলল খয়রা। কিরে মাইনকা রাস্তায় খাড়াইয়া খাড়াইয়া রিশকা গুনতাছস নি? ঠেলবি না?
মানিক ম্লান মুখে হাসল। ঠেলুম কেমনে ধরতেই পারি না! দৌড়াইয়া যাওনের আগেই জুয়ান বেডারা আইয়া ধইরা হালায়। অগ লগে দৌড়ে পারি না, জোরে পারি না।
বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল মানিকের।
খয়রা বলল, হ। ওই হালাগ লগে পারন যাইব না।
তারপর একটু থেমে বলল, বিয়ান থে কয় টেকা কামাইছস?
দুই টেকা। মাত্র চাইরখান রিকশা ধরতে পারছিলাম।
আমি তো তাও পারি নাই। তিনখান পারছি। দেড়টেকার কাম অইছে।
আগে এই টাইমের মইদ্যে পাচ ছয় টেকার কাম কইরা হালাইতাম।
কাইল কত কামাইছস?

www.shopnil.com

এগারো টেকা।

তাও তো আমার থে ভালা।

তুই কত?

সাড়ে নয় টেকা।

আর ওই জুয়ান হালারা কত কইরা কামায় জানচ? পনচাস টেকা ষাইট টেকা।

কচ কী!

আবে হ। এহেক হালায় একশ দেশশ কইরা রিশকা ঠেলে। শইলে আত্তির লাহান জোর হালাগ, ঠেলব না ক্যা!

মানিক চিন্তিত গলায় বলল, এমুন অইলে আমরা বাচুম কেমনে?

খয়রা দুঃখি মুখ করে বলল, আমাগ লাহান পোলাপানের বাচনের কোন উপায় নাই। মইরা যাওন লাগব।

ঠিক তখুনি বিশাল মোটা এক লোক নিয়ে একটি রিকশা এল। রিকশাঅলাটা বুড় মতন। মোটা লোকটিকে টানতে জান বেরিয়ে যাচ্ছিল তার। ঘামে জবজব করছে শরীর। অতি কষ্টে রিকশায় প্যাডেল মারছে আর হা করে শ্বাস টানছে। রিকশাটি দেখেই সোনা এবং খয়রা এক সঙ্গে ছুটে গেল। এক সঙ্গেই ধরল রিকশা।

খয়রা বলল, আরে ওই মাইনকা ছাড় ছাড়। আমি আগে ধরছি।

মানিক বলল, না আমি আগে ধরছি। তুই ছাড়।

সঙ্গে সঙ্গে রাগে ফুঁসে উঠল খয়রা। আমার লগে রংবাজি। নাকশা ফাটাইয়া ফালামু। রিশকা ছাড় কইলাম।

মানিক কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই রিকশায় বসা মোটা লোকটি বাঁজখাই গলায় বলল, এই এত প্যাটর প্যাটর করছিস কেন! দু'জনে মিলে ঠেল। আট আনা দু'জনে ভাগ করে নিবি।

খয়রা বলল, ক্যালা। আমি তো আগে ধরছি। আমি একলা ঠেলুম।

মোটা লোকটি এবার মুখ ঘুরিয়ে খয়রার দিকে তাকাল। তারপর বিকট ভঙ্গিতে হাসল। আমার সাইজ দেখেছিস। তুই একা ঠেলে এই অত উঁচু পুলের ওপর তুলবি আমাকে! সঙ্গে যে তোর বাপকেও লাগবে বাপ।

তারপর বিশাল একটা হুংকার দিল। যা বলছি তাই কর। দু'জনে মিলে ঠেল। পয়সা আট আনা। চার আনা করে ভাগ করে নিবি।

খয়রা কিংবা মানিক কেউ কোন কথা বলল না। দু'জনে মিলে রিকশা ঠেলতে লাগল। তবু ওই অত মোটা লোকটিকে ঠেলে পুলের ওপর তুলতে ঘাম বেরিয়ে গেল তাদের।

পুলের ওপর রিকশা ওঠার পর মোটা লোকটি পকেট হাতরে দুটো চকচকে সিকি বের করল। তারপর একটা সিকি দিল খয়রাকে আর একটা মানিককে। খে খে করে হেসে বলল, আমি মানুষ মোটা হলে কী হবে বুদ্ধি খুবই চিকন বুঝলি। কী সুন্দর করে আট আনায় দু'জনকে কাজে লাগালাম। পয়সাটাও দিলাম ভাগ করে যাতে পরে তোদের দু'জনের মধ্যে মারামারি না লাগে। যা ভাগ।

রিকশাটি চলে যাওয়ার পর মোটা লোকটিকে বিড়বিড় করে একটা গাল দিল খয়রা। তারপর খানিক আগের ঝগড়ার কথা ভুলে মানিকের কাঁধে হাত দিল। পুল থেকে নামতে নামতে বলল, আরে এই মাইনকা ভালা একটা বুদ্ধি আইছে মাতায়।

মানিক আনমনা গলায় বলল, কী?

দুইজনে এক লগে কাম করলে কেমুন অয়!

কথাটা বুঝতে পারল না মানিক। মুখ ঘুরিয়ে খয়রার মুখের দিকে তাকাল। দুইজনে এক লগে মানে কেমনে কাম করুম?

খয়রা বলল, অহন যেমনে করলাম।

দুইজনে একটা কইরা রিকশা ঠেলুম?

হ। তয় কায়দাটা অন্য।

কেমুন?

বড় বেডাগ লগে তো দৌড়াইয়া পারি না, শইল্লের জোরে পারি না। কামডা করন লাগব কী, আমরা তো দুইজন, একজন পুল থিকা ম্যালা দূরে থাকুম, এত দূরে যেহেনে কোন ঠেলাআলা যায় না, রিশকা দেকলেই রিশকাডা ধইরা হেইডার পিছে পিছে দৌড়াইয়া আমু একজনে, আরেকজন থাকুম পোলের গড়ায়, হেয় ঠেইলা উডাইব। টেকা যা অয় আর্দেক আর্দেক। এমনে কাম করলে দেকবি ম্যালা রিশকা পাওয়া যাইব। পনচাস ষাইট টেকার কাম অইয়া যাইব। ভাগে এহেক জনের পঁচিশ তিরিশ টেকা কইরা পরব।

খয়রার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল মানিক। আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল। ভালা বুদ্ধি বাইর করছচ। ল এমনেই করি।

নিজের বুদ্ধির তারিফ শুনে খয়রাও খুব খুশি। ক্যালানো একটা হাসি হেসে বলল, আবে আমার ব্রেন তো বহুত ভালা। তুই জানচ না।

তারপর একটু থেমে বলল, তয় আরেকখানা কতা আছে। একজন খালি হারাদিন রিশকার পিছে দৌড়াইবো আর আরেকজন খালি ঠেলব হেইডা কইলাম অইব না। এহেনে বি আর্দেক আর্দেক।

মানিক মাথা নাড়ল।

খয়রা বলল, তয় ল। কামে লাইগা যাই। পয়লা তুই দৌড়া। ম্যালা দূরে যা গা। আমি পোলের কোনায় আছি।

মানিক কথা বলল না। দূরের রাস্তার দিকে দৌড়ে চলে গেল।

সন্ধের মুখে মুখে বেশ একটা বাধা পেল মানিক। সকাল থেকে, মানে খয়রার সঙ্গে চুক্তি হওয়ার পর থেকে শেষ দুপুর অব্দি দূরের রাস্তা থেকে রিকশার পিছু পিছু দৌড়ে আসার কাজটা সে করেছে। তারপর দুজন একসঙ্গে খেয়েছে। খেতে বসে হিশেব করে দেখেছে সাড়ে সাতাশ টাকার কাজ দু'জনের হয়েছে। পৌনে চৌদ্দ টাকা করে একেক জনের ভাগে। দেখে উৎসাহ আরও বেড়ে গেছে তাদের। খয়রা মুগ্ধ গলায় বলেছে, কিরে মাইনকা কিমুন লাগতাছে অহন? আদা বেলায় এত টেকা। রাইত দশটা তরুক কাম করলে দেকবি আরও কত টেকা অয়।

মানিক খুশি হয়ে বলেছে, হ বুদ্ধিটা ভালা বাইর করছচ। অহন খাইয়া দাইয়া তুই ঠেলবি আমি দৌড়ামু।

আইচ্ছা।

তারপর থেকে পুলের মুখে দাঁড়িয়ে থেকেছে মানিক। দূরের রাস্তা থেকে রিকশার পিছু পিছু ছুটে মানিকের কাছাকাছি এসে চিৎকার করে মানিককে ডেকেছে খয়রা। আবে মাইনকা ধর ধর।

মানিক ছুটে গিয়ে ঠেলতে শুরু করেছে। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর, টাকা পয়সার হিশেবটা জানার পর থেকে মানিকের উৎসাহ যে কী পরিমাণ বেড়েছে। এভাবে কাজ করলে মঙ্গলবারের মধ্যে লুঙ্গি পিরনের টাকাটা তার হয়ে যাবে। নতুন লুঙ্গি পিরন পরে সোনাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে পারবে। মাসখানেক কাজ করার পর বস্তিতে ঘরও ভাড়া নিতে পারবে।

এসব চিন্তায় বিভোর হয়ে রিকশা ঠেলছিল মানিক। সন্ধের মুখে মুখে হল কী, একটা রিকশা ঠেলে তুলেছে, যাত্রীটি মাস্তান টাইপের, পুলের ওপর রিকশা ওঠার পর মানিককে বলল, আবে যা অহন ফোট। পরে পয়সা লইচ। ভাংতি পয়সা নাই।

মানিক খুবই অবাক হল। এই ধরনের লোক এখানে রিকশা ঠেলতে এসে কখনও দেখেনি সে। পরে পয়সা নেবে। লোকটিকে মানিক পাবে কোথায়। লোকটিকে তো সে চেনেই না। রিকশা

www.shopnil.com

ঠেলার ক্ষেত্রে বাকি বক্কার ব্যাপার তো কিছু নেই।
প্রথমে কথাটা যেন বুঝতেই পারল না মানিক। বলল, কী কইলেন?
লোকটি খরচোখে মানিকের দিকে তাকাল। মোটা গম্ভীর গলায় বলল, বোজচ নাই কী কইছি। অহন ভাংতি পয়সা নাই। পরে লইচ। পুলের ওপর রিকশা ওঠার পর রিকশাঅলাও সাধারণত রিকশা থামিয়ে থামায় কিংবা স্লো করে, অর্থাৎ ঠেলাঅলাদের পয়সা নেয়ার সময় দিতে হয়। এই রিকশাঅলাটিও তাই করেছে। লোকটি রিকশাঅলাকে বলল, চালাও।
রিকশা চলতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে রিকশা টেনে ধরল মানিক। কী অইল পয়সা দিলেন না?
লোকটি বলল, কইলাম যে পরে লইচ। অহন নাই। যা ফোট।
মানিক রেগে গেল। আপনেরে পামু কই। আপনেরে আমি চিনি?
বাকি অইব না। দেন পয়সা দেন।
এবার যাত্রীর পক্ষে কথা বলল রিকশাঅলা। সাবে যহন কইছে দিয়া দিব। যা। হেরে এহেনকার বেবাকতে চিনে।
আমি চিনি না। আমার পয়সা অহনই দেওন লাগব।
রিকশাটি ততক্ষণে পুলের অন্যপাশের ঢালে নেমে গেল। পুল থেকে নামার সময় রিকশার গতি হয় মারাত্মক। ব্রেক চেপেও আয়ত্তে রাখা যায় না। এই রিকশাটিও চলছিল সেই গতিতে। মানিক দিশেহারার মত ছুটতে লাগল রিকশার পিছু পিছু। চিৎকার করে বলতে লাগল, পয়সা দিয়া যান। ও মিয়া আমার পয়সা দিয়া যান।
তখুনি ঘটল অঘটন। দৌড়ে রিকশার সঙ্গে গতি রাখতে পারল না মানিক। পায়ে পা বেঁধে হুড়মুড় করে পড়ল রাস্তার ওপর। কয়েক মুহূর্ত চোখে কিছু দেখতে পেল না। অন্ধকার, কেবলই অন্ধকার চারদিকে।

সোনা উতলা গলায় বলল, অইজ যে এত তাড়াতাড়ি আইলি ভাই?
মানিক কাতর গলায় বলল, শইলডা ভালা লাগতাছে না বইন। চোট পাইছি।
কথাটা শনার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধ্বক করে উঠল সোনার। কেমনে চোট পাইলি?
পোলের ঢালে পইড়া গেছিলাম।
হায় হায় কেমনে পড়লি?
মানিক কথা বলল না। চুপ করে রইল। বন্ধ দরোজার এ পাশ থেকে সোনা টের পেল বারান্দায় শুয়ে পড়েছে মানিক। মেঝেতে মানিকের শুয়ে পড়ার খসখসে মৃদু শব্দটা পেল সে।
সোনার বুকের ভেতর তখন উথাল পাথাল কষ্ট। কী রকম যে একটা অনুভূতি হচ্ছে। অদ্ভুত মায়াবি গলায় সোনা বলল, ভাই আমারে ক কেমনে পড়লি।
মানিক বেশ বড় করে শ্বাস ফেলল। সেই শ্বাসে অপরিসীম ক্লান্তি এবং শরীরের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা এক কষ্টের ছোঁয়া টের পেল সোনা। ভাইর মুখটি সে দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু বুঝতে পারছে ক্লান্তি এবং ব্যথায় মুখটা করুণ বিষণ্ণ হয়ে গেছে মানিকের। সোনার ইচ্ছে করে দরোজা খুলে ছুটে গিয়ে ভাইকে জড়িয়ে ধরে। বুকে পিঠে গালে মাথায় হাত বুলিয়ে ক্লান্তি দূর করে ভাইয়ের। চোট পাওয়া জায়গার শুশ্রূসা করে।
কিন্তু এই দরোজা খোলার সাধ্য সোনার নেই।
ভারি একটা অনুনয়ের গলায় সোনা বলল, আমারে ক ভাই কেমনে পড়লি। কোনহানে চোট পাইলি।
শুকনো খসখসে গলায় মানিক বলল, আমার কতা কইতে ভাল্লাগতাছে না। তুই চিন্তা করিছ না।

খুব বেশি চোট না। অল্প। দু একদিনের মইদ্দেই ভালা অইয়া যাইব। আমার ঘুম আইতাছে। তুইও ঘুমাইয়া থাক।
সোনা বুঝে গেল ব্যাপারটা তার কাছে লুকিয়ে যেতে চাইছে মানিক। সোনার কষ্ট হবে ভেবে চোট পাওয়ার কথাটা চেপে যেতে চাইছে। এই সব মুহূর্তে অদ্ভুত একটা জেদ হয় সোনার। জেদটা ভালবাসার জেদ। একজনের জন্যে আরেক জনের তীব্র অনুভূতির জেদ।
সেই জেদটা সোনার হল। গম্ভীর গলায় বলল, কেমনে পড়ছছ, কোনহানে চোট পাইছছ, কতাহানি চোট পাইছছ বেবাক কতা আমারে অহন কওন লাগব। যুদি না কছ আমি ঘুমামু না। হারারাইত এই দরজার লগে পিঠ ঠেকাইয়া বইয়া থাকুম।
সোনার এরকম জেদের কথা মানিক জানে। সোনা যা বলেছে সত্যি সত্যি সে তা করতে পারে। মানিক একটা ঢোক গিলল। তরে লইয়া ম্যালা ঝামেলা। বড় জিদ করছ তুই।
তুই আমারে কবি না ক্যা।
ক্লান্ত গলায় টেনে টেনে ঘটনাটা বলল মানিক। শুনতে শুনতে জলে চোখ ভরে এল সোনার। গলা বুজে এল। জড়ানো গলায় সোনা বলল, যেমনে পড়ছছ ওমনে তো ম্যালা চোট পাওনের কতা।
মানিক বলল, চোট পাইছি। তয় খুব বেশি না।
চোটটা বেশি পাইছছ কোনহানে?
ডাইন পায়ে।
পায়ের কোনহানে?
আড়ুতে। অনেকখানি জাগার চামড়া ইউট্টা গেছে। খুব জ্বলতে। খুব রক্ত বাইর অইছে।
কথাটা শনার সঙ্গে সঙ্গে সোনা টের পেল তারও ডান পায়ের হাঁটুর কাছে, ধারালো রাস্তায় আচমকা ঘষা খেয়ে অনেকখানি চামড়া উঠে গেছে। ম্যালা রক্ত পড়ছে। প্রচণ্ড জ্বালা করছে জায়গাটি। নিজের অজান্তে ব্যথার অস্ফুট একটা শব্দ করল সোনা।
মানিক উতলা গলায় বলল, কী অইল অমুন করতাছছ ক্যা।
সোনা কথা বলল না।
মানিক বলল, কতা কছ না ক্যা।
ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে সোনা। দুঃখি বিষণ্ণ গলায় বলল, খালি ওই পায়েই চোট পাইছছ না আরও কোন জাগায়?
বেশি পাইছি পায়েই। হাডিতে পারতাছিলাম না। রিকশা ঠেলুম কেমনে। এর লেইগা আইয়া পড়লাম।
আমার কাছে চাইপা থাকিস না ভাই। আর কোনহানে চোট পাইছছ ক।
এবার মানিক সামান্য বিরক্ত হল। কইলাম তো বেশি পাইছি পায়েই। তহন বুজি নাই, অহন বুঝতাছি, যেমনে পড়ছি পুরা শইল্লেই চোট পাইছি। আড়ুর যে জাগাডার চামড়া উইট্টা গেছে হেই জাগাডা জ্বলতাছে। আর পুরা শইল্লের ভিতরেই বেদনা করতাছে। শইল্লের বেদনায় শইল গরম অইয়া গেছে। মনে অয় জ্বর আইব।
মানিকের কথা শুনতে শুনতে নিজের শরীরের অভ্যন্তরে অদ্ভুত এক ব্যথা বেদনা টের পেল সোনা। মনে হল রিকশার পেছনে ছুটতে ছুটতে মানিক নয় আসলে সোনাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে লোহার পুলের শক্ত ঢালে। ডান পায়ের হাঁটুর কাছে চামড়া তো উঠেছেই শরীরের পরতে পরতে জমেছে ব্যথা বেদনা। শরীরের ব্যথায় শরীর গরম হয়ে গেছে সোনার। মনে হচ্ছে জ্বর আসবে।
এই ঘোরটা বেশিক্ষণ থাকল না সোনার। এক সময় কী রকম ছটফট করে উঠল সোনা। বলল, চোটটা পাইছছ কুনসুম?

www.shopnil.com

মানিক ক্লান্ত গলায় বলল, হাজের সুম।
কাম করছচ কয় টেকার?
উন্নিশ টেকার।
তারপর খয়রার কথা বলল মানিক। খয়রার সঙ্গে একত্র হয়ে কেমন করে টেক্কা দিয়েছে জোয়ান তাগড়া লোকগুলোকে সেসব বলল। খয়রার বুদ্ধি মত কাজ না করলে সারাদিনে যে আট দশ টাকার বেশি রোজগার করতে পারত না সেসব বলল। কিন্তু সোনা এসবের কিছুই শুনতে পেল না। সে বলল সম্পূর্ণ অন্য কথা এত বড় একটা চোট পাইলি ভাই, ডাক্তারের কাছে গেলি না ক্যা?
সোনার কথা শুনে মৃদু হাসল মানিক। তর কী মাতা খারাপ অইছে? আমাগ লাহান মাইনষে ডাক্তারের কাছে যায়নি। ডাক্তারের কাছে যাইতে ম্যালা টেকা লাগে। দেইখা সুই দিত, অষইদ দিত এই কয়দিন কাম কইরা যেই কয়টেকা জমাইছি বেবাকঐ লইয়া যাইত ডাক্তরে। মঙ্গলবার দিন আমার আর লুঙ্গি পিরন কিনোনের টেকা থাকত না। বস্তিতে ঘর ভাড়া লওনের দিন এক দুইমাস পিছাইয়া যাইত।
তারপর একটু থেমে মানিক বলল, তুই এত চিনতা করিচ না বইন। কাইল বিয়ানেই দেকবি ভালা অইয়া গেছি আমি। কাইল বিয়ানেই দেকবি কামে গেছি।
বুক কাঁপিয়ে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সোনার।
মানিক বলল, ভাত খাইছচ?
সোনা বলল, তুই খাইছচ?
দুইফরে খাইছি। রাইতে খাই নাই। শইল্লের বেদনায় ভাত খাইতে ইচ্ছা করল না।
সোনা মনে মনে বলল, ভাই আমিও দুইফরে খাইছি রাইতে খাই নাই। তর শইল্লের বেদনা আমারও শইল্লে বেদনা। রাইতে ভাত খাইতে আমারও অহন আর ইচ্ছা করতাছে না। তুই না খাইয়া আছচ আমিও আইজ রাইতে না খাইয়া থাকুম।
তখন বেশ একটা কষ্টের শব্দ করল মানিক। তারপর পাশ ফিরল। বলল, বইন অহন যুদি তুই আমার কাছে থাকতি, তরে প্যাচাইয়া ধরলে শইল্লের বেদনা থাকত না আমার। শইল গরম অইছে, জ্বর আইব। জ্বরডা আইত না। তর গলা প্যাছাইয়া ধইরা আরামসে গুম যাইতাম। কাইল বিয়ানে আড়ুর খাও হুগাইয়া যাইত।
মানিকের কথা শুনতে শুনতে বুকের ভেতর হাজার লক্ষ বছরের জমে থাকা এক কান্না ঠেলে উঠল সোনার। বুক ফেটে গেল তার। চোখ ফেটে গেল। তালাবন্ধ কাঠের দরোজায় মুখ রেখে হু হু করে কাঁদতে লাগল সোনা।

দরোজার ফাঁক ফোকড় দিয়ে নিমপাতার মত দেখতে দু তিন টুকর রোদ এসে ঘরের ভেতর ঢোকে। সকাল বেলা তার একটি টুকর পড়ে সোনার একেবারে মুখে। রোদ তো যত ছোটই হোক তার নিজস্ব অদ্ভুত এক উষ্ণতা আছে। সেই উষ্ণতাটুকু প্রিয়জনের স্পর্শের মত। এই জায়গাটায় শুয়ে সকালবেলা রোদের স্পর্শটুকু পেয়ে ঘুম ভাঙে সোনার। মুখের ওপর ওইটুকু রোদ পড়তেই সোনার মনে হয় সময়টা এখন নয়। বেশ অনেকদিন আগে। মা বেঁচে আছে। সকালবেলা কাজে যাওয়ার সময় ঘুমন্ত সোনার মুখে আলতো করে বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আঙুলের ডগার মোলায়েম স্পর্শ। সেই স্পর্শে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে সোনার। চোখ মেলেই সোনা যেন দেখতে

পাবে মায়ের হাসিমাখা মুখখানি।
কিন্তু দৃশ্যত তা হয় না। চোখ মেলে সোনা দেখে কঠোর কঠিন এক দরোজার পাশে খোলা মেঝেতে শুয়ে আছে সে। মাথার ওপর দরোজাটির মাঝখানে স্থির হয়ে আছে কাল রঙের ভারি এক তালা। বুকের ভেতর কেমন যে করে ওঠে তার।
আজ সকালে ঘরে রোদ ঢোকার আগেই ঘুম ভেঙে গেছে সোনার। ঘুমের ভেতর থেকেই সোনা শুনতে পেয়েছিল দরোজার ওপাশে, বারান্দায় কে যেন শঙ্কাছে। অদ্ভুত কাতর এবং তীব্র যন্ত্রণাময় অস্ফুট এক ধ্বনি। সেই শব্দে ধরফর করে উঠে বসেছে সোনা। দরোজায় কান পেতে স্পষ্ট করে সোনার চেষ্টা করেছে শব্দের উৎস। কে অমন করছে। মানিক।
ভাইটি তার কাল সন্ধ্যায় রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্রচন্ড ব্যথা পেয়েছে। ডান পায়ের হাঁটুতে হয়েছে বিশাল ক্ষত। শরীরে তীব্র ব্যথা বেদনা নিয়ে, জ্বরোভাব নিয়ে সন্ধের পর পরই ফিরে এসেছে। শরীরের সেই ব্যথা কী তাহলে বেড়েছে মানিকের। এক রাতেই কী পেকে গেল হাঁটুর ঘা। সেই যন্ত্রণায় কী প্রবল হয়েছে জ্বর।
হঠাৎ করে একেবারেই দিশেহারা হয়ে গেল সোনা ব্যাকুল গলায় ডাকল, ভাই ভাইরে। ও ভাই, কী অইছে তর। কী অইছে।
বারান্দা থেকে মুমূর্ষ গলায় সাড়া দিল মানিক। জ্বরে শইল পুইড়া যাইতাছে রে বইন। শইল্লের বেদনায় শইল নড়াইতে পারি না। ডাইন পাওডা আর নিজের পাও মনে অয় না। গলাডা হুকাইয়া লাকা খড়ির মতন অইয়া গেছে। মাথার রগ মনে অয় ছিড়া যাইব।
কথা বলতে বলতে শেষ দিকে গুঙিয়ে কেঁদে উঠল মানিক।
এদিকে সোনা তখন আর নিজের মধ্যে নেই। মানিকের কথা শুনতে শুনতে আবার সেরকম অনুভূতি হল তার। তীব্র জ্বরে সোনারও যেন শরীর পুড়ে যেতে লাগল। শরীরের ব্যথায় শরীর নড়াতে পারে না সোনা। ডান পাটাকে আর নিজের পা মনে হয় না। গলা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে। মাথার শিরা উপশিরা এমন করে দপদপ করছে যেন যা যে কোন মুহূর্তে ছিড়ে যাবে।
বারান্দায় মানিক তখন গুঙিয়ে গুঙিয়ে বলছে, পানি ইট্টু পানি যুদি খাইতে পারতাম।
কথাটা শনার সঙ্গে সঙ্গে আপন পরিবেশের কথা ভুলে গেল সোনা। পাগলের মত ছুটে গেল রান্নাঘরে। কলসি থেকে পুরা একগ্লাস জল ঢেলে ছুটে এল ড্রয়িংরুমের দরোজায়। এসেই তালাটা দেখতে পেল। ভেতরে ভেতরে কী যে এক ধাক্কা খেল। সোনার মনে ছিল চারদিক থেকে তালাবন্ধ একটা জায়গায় বন্দি হয়ে আছে সে। চাবি নিয়ে স্বার্থপর মানুষ চলে গেছে বহুদূর।
পানি ভর্তি গ্লাসের দিকে তাকিয়ে বুক ফেটে গেল সোনার, চোখ ফেটে গেল। ভেতর থেকে বাড়ির অন্যান্য লোকের উদ্দেশে যে চিৎকার করে বলবে, আপনেরা কে কোনহানে আছেন, আসেন, বাইর থিকা দরোজা খুইল্লা দেন, না খুলতে পারলে ভাইঙ্গা ফালান, আমি বাইর অমু, বারিন্দায় আমার ভাইর কাছে যামু। পানির তেষ্টায় আমার ভাই মইরা যাইতাছে। আমার ভাইর খুব অসুখ। এসব বলবার ক্ষমতাও সোনার নেই। মমর মা বলে গেছে সোনাকে ভেতরে রেখে বাইরে থেকে যে তারা তালা লাগিয়ে যাচ্ছে এ কথা বাড়ির কেউ জানে না। সোনাকে থাকতে হবে নিঃশব্দে। চুপচাপ। সোনার ভাই ছাড়া আর কেউ যেন না জানে। সোনার ভাই ফিরবে গভীর রাতে চলে যাবে আজানের সঙ্গে সঙ্গে। দরোজার এপাশ থেকে ফিসফিস করে ভাইর সঙ্গে কথা বলবে সোনা সে কথা নিশ্চয় অন্য কেউ শুনতে পারবে না। হায়রে কপাল!
পানির গ্লাস হাতে দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সোনা, বারান্দায় মানিক কাতরাছে পানি ইট্টু পানি। দরোজা খুলে পানিটুকু ভাইর মুখে দেয়ার ক্ষমতা নেই সোনার। এই দুঃখে সোনা যে একটু কাঁদবে এই মুহূর্তে সেই অনুভূতিও নেই সোনার। সোনা পাথর হয়ে গেছে। সোনা

www.shopnil.com

গাছপালা হয়ে গেছে। পাথর কিংবা গাছপালার কোন ভাষা থাকে না।

গভীর রাতে মানিকের এক সময় মনে হল তার হাত পা সব ধনুকের মত বাঁকা হয়ে আসছে। আঙুল এবং হাতের মুঠে বাঁকা হয়ে আসছে। পায়ের আঙুল এবং পাতা বাঁকা হয়ে আসছে। চোয়াল মিশে যাচ্ছে চোয়ালের সঙ্গে। দাঁত চেপে বসছে দাঁতে। শরীর আর শরীরের মধ্যে নেই। শরীর থেকে যেন প্রচন্ড চাপে বেরিয়ে আসতে চাইছে শরীর। এ শরীর যেন আসলে ছিল এক খোলস। কিংবা জামা কাপড়ের মত এক আবরণ। মানিক যেন শরীর থেকে ধীর মন্থর গতিতে খুলতে শুরু করেছে তার জামা কাপড়। কিংবা বদলাতে শুরু করেছে জন্ম মুহূর্তের পর থেকে শরীরের ওপর আটকে রাখা অদৃশ্য এক শরীরী খোলস। মানিক যেন অন্য এক মানুষে রূপান্তরিত হচ্ছে। অচিন এক মানুষ। এতকালকার চেনা এই শরীর, হাত পা মুখ চোখ নাক এসবের কোনটিই যেন তার নিজস্ব নয়। নিজস্ব ছিল না। এইসব সম্পদ কোন এক মহাজন তাকে ধার দিয়েছিল। আজ সেই ধার পরিশোধের সময় হয়েছে। হঠাৎ করেই মহাজন এসে দাঁড়িয়েছেন শিয়রে। ধার শধ না করে মানিকের কোন উপায় নেই। মহাজন নাছোরবান্দা। খালি হাতে ফিরবেন না।

মহাজনের ধার শধের প্রস্তুতি নিল মানিক। শরীর থেকে ধীর মন্থর গতিতে খুলল শরীর। মহাজনকে একে একে বুঝিয়ে দিতে লাগল তার পাওনা। এই নাও আমার দুটো হাত। এই হাতে বেঁচে থাকার জন্যে কত যে শ্রম করেছি আর ভালবেসে স্পর্শ করেছি প্রিয়জন। এই যে মুখখানি, নেবে? নাও। এ মুখে কোন পাপের ছায়া নেই। আছে কেবল দুঃখের ছায়া, বিষণ্ণতা, শ্রমক্লান্তি। চোখ দুটো নাও, তোমাকে দিলাম। এ চোখ কত যে স্বপ্ন দেখেছে। দুঃখের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। ভালবাসার মানুষকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। একটি নতুন জামা, একটি মুখের হাসির স্বপ্ন। পা দুখানি নেবে না? নাও। তাও দিলাম। এই পা কত যে পথ পরিশ্রম করেছে। তবু খুঁজে পায়নি পথের দিশা। সব, সব তোমাকে দিলাম। এখন আমি নিঃস্ব। ভিখিরী। আমার আর নিজস্ব কিছু নেই একাকী চলে যাবো বহুদূরের কোন পথে। পথের শেষ কোথায় কে জানে।

আরেকজন মানুষের হাত ধরে এই পৃথিবীতে এসেছিল মানিক। আরেকজন মানুষকে আঁকড়ে ধরে বড় হয়েছিল। সেই মানুষটির কথা এখন আর মনে নেই তার। মানুষটি যে দরোজার ওপাশেই দাঁড়িয়ে আছে, তালাবন্ধ নিরেট দরোজায় মুখ রেখে হু হু করে কাঁদছে, ছোট্ট কোমল মুঠিতে অবিরাম আঘাত করছে দরোজায়, কান্নাকাতর গলায় কেবলই বলছে, খুলে দাও, দরোজা খুলে দাও। সে কথা কেন শুনতে পায় না মানিক। সোনাকে ফেলে একাকি বহুদূরের অচিন পথে কেমন করে চলে যাবে সে।

Thank You For Visiting
www.shopnil.com